বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব
এবং
হিন্দুধর্ম্ম হইতে ইহার পার্থক্য

শ্রীউমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী

চট্টগ্রাম-বাংলাদেশ

২০০২ ইংরেজী ২৫৪৬ বুদ্ধাব্দ

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by B Jyoti Bhante

সিরিজ গ্রন্থমালা - ৮

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্ম হইতে ইহার পার্থক্য

শ্রী উমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী
সদ্ধর্ম প্রবর্দ্ধক
তত্ত্বচিন্তামণি, বিদ্যানিধি,
সাহিত্যরত্ন, সদ্ধর্মতত্ত্ববারিধি

বুডি-স্ট রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দির
বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, চট্টগ্রাম।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্ম হইতে ইহার পার্থক্য

শ্রী উমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী

প্রথম প্রকাশ – ২৫- ৮-১৯৪৫
দ্বিতীয় প্রকাশ – মাঘী পূর্ণিমা, ১৯৯৮
প্রকাশক ঃ
শ্রী তড়িৎকান্তি মুৎসুদ্দী (চীপ জর্জ-সিটি-কোর্ট, কলিকাতা)।

তৃতীয় প্রকাশ - প্রবারণা পূর্ণিমা - ২০০২
প্রকাশক ঃ
বুডি-স্ট রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার
বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, চট্টগ্রাম।

যার সহায়তায় প্রকাশিত ঃ
প্রয়াত পিতা বিশিষ্ট সমাজসেবী পাঁচকড়ি বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতি স্মরণে-
সাংবাদিক কাঞ্চন বড়ুয়া, কণিকা ইন্টারন্যানশাল, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
গ্রাম ঃ কোটেরপাড়, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে ঃ
সৈকত বড়ুয়া (লিটন)
মিটন কান্তি বড়ুয়া

প্রাপ্তি স্থান ঃ নালন্দা লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রক ঃ **ওসাকা প্রেস**, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শ্রদ্ধাদান ঃ **পনের টাকা**।

দ্বিতীয় প্রকাশকের নিবেদন

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্ম হইতে ইহার পার্থক্য ঃ এই পুস্তকটি আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দি কর্তৃক ১৯৪৫ সালে রচিত হয়েছিল। মূল পুস্তকটি ইংরেজী ভাষায় রচিত ও East and West Fraternity সংস্থার সম্মেলনে পঠিত। গ্রন্থকার এই অভিভাষণের নামকরণ করেন Outlines of Buddhism and How Far It Differs From Hinduism. পরবর্তীকালে তিনি নিজেই এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থটিতে বৌদ্ধধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ যেমন গৌতম বুদ্ধের সাধনা, তাঁর সিদ্ধি, তাঁর উপলব্ধ সত্য জ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রকাশ ও প্রচার, জীবনশৃঙ্খলের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, জীবনের মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় প্রদর্শিত হয়েছে। গ্রন্থটিকে আকারে ক্ষুদ্র মনে হলেও বুদ্ধের ধর্মকে বোঝবার পক্ষে সহজ, সরল ও প্রশস্ত পথ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে অথবা বলা যেতে পারে বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাষট্টী প্রকার দার্শনিক মতবাদের যে সন্ধান পাওয়া যায় তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ব্রহ্মজাল সূত্রে। পরবর্তীকালে ক্রমে এই দার্শনিক মতবাদসমূহ নয়টি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে তিনটি শাখা নাস্তি করূপে চিহ্নিত অপর ছয়টি শাখা আস্তিকরূপে পরিগণিত।

বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন এই অর্থে যে তিনি ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি স্বীকার করেননি। প্রবক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন বিভাজ্যবাদী, দার্শনিক হিসাবে তিনি ছিলেন ক্ষণিকবাদী এবং সাধারণ জনগণের নিকট তিনি ছিলেন নীতিমার্গের পথিক।

এই গ্রন্থে ষড়দর্শন শাস্ত্রের অনুগামীদের সঙ্গে বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের যে মৌলিক প্রভেদ রয়েছে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে সফল বলা যেতে পারে। যে প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার প্রয়োজন আজও সমভাবে বিরাজমান। প্রয়োজন এই কারণে যে, বুদ্ধের মতবাদকে বুঝতে হলে সমকালীন

দার্শনিকদের মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এই গ্রন্থ সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে মনে করে পুনরায় এই মূল্যবান গ্রন্থটি মুদ্রণ করা হলো।

গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষুর উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে কোন দিনই একাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। আমি তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিনয়শ্রী ভিক্ষু এবং শ্রীমিলনকান্তি চৌধুরী মহোদয়গণও বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। জাগরণী প্রেসের কর্মীবৃন্দ স্বল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তজ্জন্য তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক সমাজ যদি কিঞ্চিত উপকৃত হন তাহলে আমার অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে মনে করবো।

২২শে. ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ শ্রীতড়িৎকান্তি মুৎসুদ্দী
কলিকাতা

শ্রী উমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী : জীবন ও কর্ম

বাঙ্গালি বৌদ্ধইতিহাসে শ্রী উমেশচন্দ্র মুচ্ছদী সমাজ বিনির্মাণে মননশীলতা চর্চার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য নাম। তাঁর বহুল প্রশংসিত বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব এবং হিন্দু ধর্ম হইতে ইহার পার্থক্য গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটি 'বুডি-স্ট রিচার্স এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার বাংলাদেশ' এর অষ্টম প্রকাশনা। বর্তমান প্রজন্ম তাঁকে চেনে না জানে না। তাই তাঁর জীবন ও কর্মের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিচে দেয়া হল:

জন্ম ঃ ১৮৮১ নভেম্বর। ১৪ জন্মস্থান ঃ রাউজান থানার মহামুনি পাহাড়তলী। বাবা ঃ রামমনি মুৎসুদ্দী। মা ঃ জুরবতী মুৎসুদ্দী। একমাত্র পুত্র সন্তান। মাত্র চার বছর বয়সে পিতৃহারা হন। লেখা-পড়া ঃ গ্রাম্য পাঠশালা, মহামুনি মডেল স্কুল-চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল। মেধাবী। মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত। প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস পাশ : ১৯০০। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ : ১৯০২।

আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন আর পড়া হয়নি। মায়ের অগোচরে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের চাকুরী নিয়ে মেদিনীপুরে কর্মজীবনের শুরু। তের দিনের মধ্যে বদলী হয়ে চট্টগ্রাম আসেন। মনে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আইন কলেজে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ:১৯১১। অতপর মায়ের নির্দেশে পুলিশের চাকুরী হতে ইস্তফা দিয়ে প্রথমে মুন্সেফ আদালতে, পরে জেলা আদালতে আইন ব্যবসায়ে নামেন। অচিরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। এই সময় সমাজসেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পিছিয়েপড়া বৌদ্ধসমাজের উন্নয়নের জন্য নানামুখী কর্মপ্রচেষ্টায় ব্রতী হন। ১৯১১ সালে রাঙ্গুনীয়া সৈদবাড়ী মধ্য ইংরেজী স্কুলকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত করার জন্য নেতৃত্ব দেন। স্ব-গ্রামে বৌদ্ধ-যুব সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সভাপতি হিসাবে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগান। বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নয়নে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কর্তৃক মহামুনি প্রমথ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা হলে পরিচালনা

কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মহামুনি ডাকঘরে টেলিগ্রাফ ব্রাঞ্চ অফিস স্থাপন করে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটান। মহামুনি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-(মহামুনি এংলো পালি ইন্সটিটিউট) এর ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত ছিলেন ১৯১৪-১৯৫৮। এর মধ্যে তিনবার সেক্রেটারী নির্বাচিত। বাঙালি বৌদ্ধসমাজের অবিসংবাদিত নেতা কৃষ্ণ নাজির চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির (১৮৮৭ মতান্তরে ১৮৭২) সহ-সম্পাদক ১৯১৩-১৯১৭, সম্পাদক : ১৯১৮-১৯২৩। বৌদ্ধবিহারের ব্যাপক উন্নয়নে অবদান রাখেন। বৌদ্ধ কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন : ১৯২০। কার্যক্রম চলেছিল ১৯৪০ পর্যন্ত। অনেকের আর্থিক সংস্থান করা হয় এ ব্যাংক থেকে। রামধন স্মৃতিবৃত্তি প্রবর্তন : ১৯২৭। সিংহলে গিয়ে পালি শিক্ষার জন্য বৃত্তি দেয়া হত এ থেকে। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমাগম প্রতিষ্ঠা : ১৯২৭। বহুজনহিতকর কাজ করেন এ সংস্থার মাধ্যমে। বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের অগ্রদূত অনাগারিক ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে যোগ দেন : ১৯৩১। বহির্বিশ্বের বৌদ্ধদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন। ১৯৩৮ সালে অগ্রসার মহাস্থবিরের জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করেন- সমাবেশে প্রখ্যাত পণ্ডিত ভিক্ষু আনন্দ কৌশল্যায়ন, অধ্যাপক ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির, ড. অরবিন্দ বড়ুয়া (ব্যারিষ্টার) প্রমুখ বিশিষ্ট ভিক্ষু সুধীজনের উপস্থিতিতে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃত। তৎকালীন মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে রাঙ্গুনিয়া পশ্চিম শিলক গ্রামে বৌদ্ধ জাতীয় মহাসম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতায় নতুন পরিস্থিতিতে বৌদ্ধদের সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে মূল্যবান রূপরেখা তুলে ধরেন। এই সম্মেলনেই প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘ : ১৯৫০ ফেব্রুয়ারী ৪। অতঃপর এই সংঘের প্রতিনিধিরূপে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাঙালি বৌদ্ধদের সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন : সিংহলে অনুষ্ঠিত বিশ্ববৌদ্ধ মহাসম্মেলনে ১৯৫০ মে ২৯। এই মহাসম্মেলনে গঠিত হয় বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ। ফেরার পথে কলকাতা ধর্মাংকুর সভায় 'বিশ্ববৌদ্ধ সম্মেলন ও আমাদের সমাজ' বিষয়ে মুদ্রিত ভাষণ দেন। নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুতে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনে লুম্বিনী যাতায়াতের পথ প্রশস্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নেপাল সরকার তা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করেন। বন্যায় আর্তপীড়িতের সেবা, পণপ্রথা বিরোধী জনমত গঠন ইত্যাদি বহু সেবামূলক কাজে তৎপর

থাকেন। ১৯৪৯ সালে নতুন রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে লণ্ডন মিউজিয়াম থেকে সারিপুত্র ও মহামোদগল্লানের পূতাস্থি এনে অর্পণকালে ওয়ার্ল্ড বুডিস্ট কনফারেন্সে তিনি বাঙালি বৌদ্ধদের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

দেশভাগ হলে দোদুল্যমান বৌদ্ধদের নিরাপত্তা বিধান ও পাকিস্তানে তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য পাকিস্তান সরকারের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন।

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বৌদ্ধ মহাসভা কর্তৃক ১৯৫৯ সালে নাগপুরের অল ইণ্ডিয়া বুডিস্ট রিলিজিয়াস কনভেনশনে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ পান। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেতে না পারলেও বক্তব্য মুদ্রিত করে পাঠান। তা সম্মেলনে পঠিত ও প্রশংসিত হয়। বিদেশে অনুরূপ আরও কয়েকটি সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে সফল অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের জেনারেল কমিটিতে বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে তিনিই প্রথম সদস্যপদ লাভ করেন।

বস্তুত সমাজহিতৈষী কর্মচঞ্চল মানুষটির শুধু সমাজ কর্ম নয়-সাহিত্য এবং দর্শন চর্চায়ও তাঁর মনস্বিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে মননদৈন্য বড়ুয়া সমাজে তিনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর রচনাবলী লক্ষ করলে বৌদ্ধসমাজ নিয়ে তাঁর চিন্তার দিগন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে এবং বড়ুয়াদের ইতিহাস-ঐতিহ্য অন্বেষণে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীতে :

১. মাতৃপূজায় মানবধর্ম [১৯২৫]
২. বড়ুয়া জাতি [১৯৫৯]
৩. বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম হইতে ইহার পার্থক্য [১৯৪৫]
৪. বিশ্বে বৌদ্ধকৃষ্টি ও সভ্যতার দান এবং বৌদ্ধধর্মের ভবিষ্যৎ [১৯৫৮]
৫. পাকিস্তানি ভিক্ষুগণের মিলনে আমার শেষ বক্তব্য [১৯৬২]

ইংরেজীতেও তিনি আবার দুটো বইয়ের ভাষান্তর করেন :

১. আউটলাইন্স অব বুডিজম এণ্ড হাউ ফার ইট ডিফারস্ ফ্রম হিন্দুইজম [১৯৪৫]
২. বুডিজমস্ কন্ট্রিবিউশন টু ওয়ার্ল্ড কালচার এণ্ড সিভিলাইজেশন এণ্ড

ফিউচার অব বুডিজম [১৯৫৮]

৩. গিফ্‌ট অব মেরিট (পুণ্যদান) [১৯৬৪]

ইংরেজী ও বাংলায় সমান দক্ষ ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর আরও সদ্ধর্মমূলক নিবন্ধাদিও প্রকাশিত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শন চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অনেক সম্মানসূচক অভিধা পান : 'সদ্ধর্ম প্রবর্দ্ধক', 'ধম্মো বিজয়তাং', 'তত্ত্বচিন্তামণি'। নদীয়া ধর্মসভা ও নবদ্বীপ পণ্ডিতসভা কর্তৃক 'বিদ্যানিধি' ও 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁর সমগ্র জীবনের ধ্যান-ধারণা ও স্বপ্ন ছিল সমাজের ঐক্য এবং জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধন। তিনি একাধারে বিশিষ্ট সমাজসেবী, যুক্তিবাদী, সমালোচক, দার্শনিক, সদ্ধর্মপ্রচারক, সংগঠক, বাগ্মী, সুলেখক ও তথ্যানুসন্ধানী। তাঁর মত প্রতিভাদীপ্ত সিংহপুরুষ বৌদ্ধসমাজে বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না।

১৯৬৫ অক্টোবর ২১ তারিখে এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

এই প্রকাশনার কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য সাংবাদিক কাঞ্চন বড়ুয়াকে ধন্যবাদ জানাই এবং তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। যারা উৎসাহ, প্রেরণা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

ড. জিনবোধি ভিক্ষু
সভাপতি

অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া
সম্পাদক

বুডি-স্ট রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার বাংলাদেশ।
তারিখ : ১৭/১০/২০০২ ইং]

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্ম হইতে ইহার পার্থক্য

(Outlines of Buddhism and how far it differs From Hinduism)

[কেপটেন মেসকল্ (Capt. Mascall R. I. A. S. C.) সাহেবের সভাপতিত্বে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভ্রাতৃত্বের' (The East & West fraternity Chittagong) ২৫/৮/৪৫ তারিখের সভায় পঠিত ইংরেজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।]

মাননীয় সভাপতি ও সভ্যবৃন্দ,

উপরোক্ত বিষয়ে আমাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করায় আমি সমিতির সদস্যগণকে বিশেষতঃ সেক্রেটারী মিঃ এ. আহমদ এম. এ., মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। বৌদ্ধশাস্ত্রসমুদ্রে এবং জটিলতাপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে আমার জ্ঞান বিন্দুসদৃশ হইলেও আমি ইহার অত্যাবশ্যকীয় তত্ত্বসমূহ সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব। আশা করি আপনারা আমার অজ্ঞানতাপ্রসূত ভ্রমপ্রমাদ অগ্রাহ্য করিবেন এবং উভয় ধর্ম্মের তুলনায় সত্যের সন্ধানে কোন কোন স্থলে অপ্রিয়সত্য প্রকট পাইলে তাহা আমার মনের স্বতঃ নিসৃত যথার্থ প্রকাশ বলিয়া সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিবেন।

সংসারে সকলই অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণভঙ্গুর, জীবনে শুধু দুঃখ, শুধু অশ্রু, শুধু ব্যথা, প্রিয়বিচ্ছেদে দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগে দুঃখ, ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, অনভীপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি দুঃখ, "দুঃখ জনমের, দুঃখ শৈশবের, দুঃখ যৌবনের, দুঃখ জরাবাদ্ধর্ক্যের, দুঃখ মরণের"। অভাব পূর্ণ হইতেই নূতন নূতন অভাব উপস্থিত হয়, এই জন্যই সংসার দুঃখময়। সুখ-আশা আশামাত্র, অতৃপ্ত কামনানলে

ঘৃতাহুতি, সুখ কেহ কখন পায় নাই, উহা আকাশকুসুম, জীবজীবনের মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র, সংসার অভাবময়, সুতরাং দুঃখময়। নিম্নপর্যায়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক সুখ সুখ নহে, দুঃখই তাহার পরিণাম। এডুইন আরনোল্ড সাহেব লিখিয়াছেন, "জীবনে শুধু উষ্ণশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস, ঝটিকা, যুদ্ধ"। জীবের প্রতি অসীমকরুণাপূর্ণ, বুদ্ধ হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজা শুদ্ধোদনের একমাত্র পুত্র সিদ্ধার্থ জীবদুঃখে এতই ব্যথিত হইলেন যে দুঃখের কারণ ও দুঃখ মুক্তির উপায় নির্ণয় করিবার জন্য স্ত্রীপুত্র, রাজ্যধন পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন ও তখনকার সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি আড়ালকালাম উদ্দকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের সমগ্র যোগবিদ্যা শিক্ষা করিলেন; তাঁহারা মাত্র "নব-সংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা" ধ্যান পর্যন্ত অভ্যাস করিতে পারিয়াছিলেন; সিদ্ধার্থ ইহাতে প্রকৃত জ্ঞান ও দুঃখমুক্তির সন্ধান না পাইয়া উরুবিল্ব পাহাড়ে প্রায় ৬ বৎসর ধরিয়া শরীর নিগ্রহ পূর্ব্বক ভীষণ তপস্যায় প্রবৃত্ত রহিলেন। গভীর সাধনারত সিদ্ধার্থের শরীরে অনশনে চর্ম্ম ও অস্থিব্যতীত আর কিছুই রহিল না, তিনি চিন্তা করিলেন, এইরূপ অনশনে ও শরীর নিগ্রহে প্রকৃত তত্ত্বলাভ সম্ভব নহে, শরীর রক্ষা না করিলে মনোবল রক্ষা ও উচ্চ চিন্তা সম্ভব নহে। সেই দিন তপস্যা হইতে উঠিলেন। এদিকে সুজাতানাম্নী ভদ্রমহিলা বনদেবতার উদ্দেশ্যে পায়সান্ন লইয়া যাইতে বটবৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থকে ঐ অন্ন দান করিলেন। সিদ্ধার্থ নিরঞ্জনা নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক ঐ অন্ন আহার করিলেন এবং নদীর অপর তীরে গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে সেই দিন অপরাহ্নে ধ্যানে বসিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত সেই আসন ত্যাগ করিবেন না।

সেই বৈশাখী পূর্ণমাসী রাত্রের শেষভাগে কাম, সন্দেহ ও শারীরিক অন্যান্য রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া পূর্ব্বকথিত ধ্যানের উপরে আরো নিম্নোক্ত চারিটি ধ্যান আয়ত্ব করিলেন -

(১) স্রোতাপত্তি – চারি আর্য্যসত্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নির্ব্বাণ স্রোতে প্রবেশ।

(২) সকৃদাগামী-লোভ, দ্বেষ ও মোহকে দমনপূর্ব্বক ইহাদিগকে একেবারে ক্ষীণতম করা এমতাবস্থঅয় সংসারে একবার মাত্র ফিরিতে হয়।

(৩) অনাগামী-যিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মজয় করিয়াছেন, কাম ও হিংসা এই দ্বিবিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হন, সেই জন্মে অর্হৎ হইতে না পারিলেও কামলোকে তাঁহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে থাকিয়াই অর্হত্ত্ব লাভ বা নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

(৪) অর্হত্ত্ব–যিনি দশ সংযোজন বা বন্ধন এবং পঞ্চনীবরণ অতিক্রম পূর্ব্বক সমস্ত কামনারূপ শত্রু ধ্বংস করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে আত্মজয় করিয়াছেন, যাঁহার আর জন্মগ্রহণ হইবেনা, যিনি সাধনাবলে অলৌকিক জ্ঞান অর্জ্জন করেন, ঋদ্ধিবলে পূর্ব্বজন্মাদি সম্বন্ধে অবগত হন, যাঁহার হৃদয় অপরিসীম আনন্দ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

মার্গ ও ফলভেদে এই চারি লোকোত্তর ধ্যান অষ্টবিধ।

সিদ্ধার্থ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ও সর্ব্বজ্ঞ [১] হইলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ জ্ঞানলাভপূর্ব্বক চারি আর্য্যসত্য এবং আর্য্য অষ্টমার্গ আবিষ্কার করিলেন, বহু জন্মের [২] সাধনার পর দুঃখমুক্তির উপায় নির্ণীত হইল।

প্রতীত্যসমুৎপাদ বা দ্বাদশ নিদানতত্ত্ব

প্রতীত্য সমুৎপাদ জগতের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের বা কার্য্যকারণ নির্ভরতার সাধারণ নিয়ম। আমি একটি দৃষ্টান্ত দিয়া সংক্ষেপে ইহার ব্যাখা করিব। আকাশে মেঘ উঠিলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে রাস্তা পিচ্ছিল হয়, রাস্তা পিচ্ছিল হইলে একটি লোক আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায়, পড়িলে তাহার শরীরে আঘাত হয়। এস্থলে আকাশে মেঘ উঠার উপর বৃষ্টিপতন নির্ভর করে, রাস্তার পিচ্ছিলতা

১। *ভারতবর্ষের ধর্ম্ম (The Religion of India) নামক পুস্তক ১২১ পৃষ্ঠায় এ. বার্থ সাহেব লিখিয়াছেন – "বুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের নিকট প্রমাণসমূহ আছে যদি আমরা তাহা অবিশ্বাস না করি তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার জীবনের বহু সংগ্রামের শেষভাগে তিনি সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।" সূর্য্যালোকে লৌহ বা প্রস্তর এক মুহূর্ত্তেই দ্রবীভূত ও বাষ্পীভূত হয়। সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ায় হৃতশক্তি সূর্য্যরশ্মি এখানে এক টুকরা কাগজও পোড়াইতে পারে। কিন্তু তাহা কাঁচে কেন্দ্রীভূত করিলে ভীষণ অনল উদ্‌গীরণ করে। সামান্য তড়িৎশক্তিকে আয়ত্ত্ব করিয়া মানব অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন করে, সূর্য্যরশ্মি বা তড়িত হইতে কোটি কোটি গুণ দ্রুতগামী মনকে সাধনার দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ অসম্ভব নয়।*

২। জাতকগ্রন্থে বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ৫৫০ জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। প্রত্যেক জন্মে ক্রমোন্নতিমূলক বিকাশের ফলে দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্টান, মৈত্রী এবং উপেক্ষাপারমিতা পরিপূর্ণ করায় তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ ঘটিয়াছিল।

বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, লোকটির পতন রাস্তার পিচ্ছিলতার উপর নির্ভর করে, তাহার আঘাত তাহার পতনের উপর নির্ভর করে। যদি আকাশে মেঘ না উঠিত তবে বৃষ্টি হইত না, বৃষ্টি না হইলে রাস্তা পিচ্ছিল হইত না ইত্যাদি; এইরূপে একটি ঘটনা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উপর নির্ভর করে এবং পরবর্ত্তী ঘটনা সৃষ্টি করে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কার্য্য-কারণে পরিণত হয়। পৃথিবীতে আমরা যাহা দেখি প্রত্যেক বিষয় এই কার্য্য ও কারণ শৃঙ্খলে আনিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনা নির্ণয় পূর্ব্বক সত্য নির্দ্ধারণ করেন। বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ দ্বারা জীবনরহস্য ও জগতরহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

এই দ্বাদশটী নিদান এই –

১। **অবিদ্যা**–অবিদ্যা সেই যাহা জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব জীবের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে: যাহা নাই তাহা আছে মনে করা, ক্ষণভঙ্গুর সংসারে নিত্যতা কল্পনা করা, যে আপনার নয় তাহাকে আপনার মনে করা অবিদ্যা। সকল জীব সাধারণতঃ অবিদ্যাজড়িত, হাহাকার ঘরে ঘরে, অশ্রুধারা চোখে চোখে, হৃদয়বেদনা নিত্যনিরন্তর, তবুও লোকে বলে সংসার সুখের! মরীচিকাকে মরীচিকা বুঝিয়াও তাহার পেছনে ধাবিত হই, কিসে আমাকে এত ভ্রান্ত করে? **অবিদ্যা**। এই অবিদ্যা হইতে সংসারের উৎপত্তি। এস্থলে গত জন্মের অবিদ্যাকেই অবিদ্যা বলা হইয়াছে, যাহা সুখের সন্ধানে অন্ধের মত কার্য্য করাইয়াছিল।

২। **সংস্কার**–ধারণা, স্মৃতি, মানুষের যতকিছু চিত্তবৃত্তি সকলই সংস্কার। একটী সাপ সম্মুখে উপস্থিত হইলে কী কী মানসিক ব্যাপার ঘটে? একটী দীর্ঘাকার বক্রগতি দ্রব্যের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের স্পর্শ হয়, তাহার রূপ অনুভূত হয় **(বেদনা)**, সেই অনুভূতি পূর্ব্বলব্ধ অনুভূতির স্মৃতির উদ্রেক করে, পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেকে চেতনা উহাকে সর্প বলিয়া চিনিয়া লয় **(সংজ্ঞা,)** তারপর বিপদের আশঙ্কা, সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য নিরূপণে বিতর্ক ও বিচার উপস্থিত হয়, তাহার ফলে পলায়নে প্রবৃত্তি জন্মে। এই স্পর্শ হইতে আরম্ভ করিয়া পলায়নে প্রবৃত্তি পর্যন্ত সকলই **সংস্কারের** অন্তর্গত। এই সকল সংস্কার একত্রযোগে আমাদের অন্তঃশরীর। ইহার পূর্ণতা সাধনের জন্য আর একটীর প্রয়োজন হয়, ঐ সকল ছাড়া আর একটী চিদবৃত্তি আছে যাহা এই সকলের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, সকলকে একত্রে টানিয়া সকলকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করে, সকলকে সাজাইয়া গোছাইয়া

আমাদের অন্তঃশরীর নির্ম্মাণ করে, এই পট কর্ত্তার নাম **বিজ্ঞান**। এই স্থলে গত জন্মের কর্ম্মের ফলে এই মানসিক প্রবৃত্তি সংস্কার উৎপন্ন হয়, এই জন্য সংস্কারের অর্থ এস্থলে গতজন্মের কুশলাকুশল কর্ম্ম।

৩। **বিজ্ঞান**–এস্থলে ইহা প্রতিসন্ধিবিজ্ঞান অর্থাৎ গত জীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের সম্বন্ধ বিজ্ঞান। ৮৯ প্রকার চিত্তের মধ্যে ১৯টি চিত্ত পুনর্জন্মের প্রকৃতি বা পতিনিমিত্ত স্থির করে, তাহাই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান।

৪। **নামরূপ**–শরীর ও মন। বেদনা (বাহ্যবস্তুর সহিত ষড়েন্দ্রিয়ের যে কোনটির স্পর্শে যে অনুভূতি হয়,) সংজ্ঞা (যেমন পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে সর্প বলিয়া চিনিয়া লওয়া) সংস্কার এবং বিজ্ঞান এই চারিটী নাম বা অন্তঃশরীর, রূপ চতুর্ভূতের সমষ্টি শরীর। গত জীবনের কর্ম্মফলে বর্তমান জীবনের আরম্ভ বা উৎপত্তি।

৫। ষড়ায়তন–মন সহ ছয়টী ইন্দ্রিয়ের দ্বার।

৬। স্পর্শ–বাহ্যবস্তুর সহিত মন ও চক্ষু, মন ও কর্ণ, মন ও নাসিকা, মন ও জিহ্বা এবং মন ও ত্বকের সংস্পর্শে যথাক্রমে রূপ, শব্দ, ঘ্রাণ, রস এবং স্পর্শ উৎপন্ন হয়, শুধু মন হইতে ভাব বা ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, জড়জগৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের আয়তন এবং ভাবজগৎ মনের আয়তন।

৭। বেদনা–স্পর্শ হইতে রূপ রসাদির অনুভূতি।

৮। তৃষ্ণা–বাহ্যবস্তুর সহিত ষড়েন্দ্রিয়ের স্পর্শে তাহা পাইবার লালসা বা প্রবৃত্তি; (চোর যখন তাহার ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান করিতে থাকে তখন তাহার চিত্তে তৃষ্ণা কাজ করিতেছে)।

৯। উপাদান–ঈপ্সিত বস্তুকে বিশেষরূপে আদান বা গ্রহণ করিবার বা ধরিয়া রাখিবার প্রবল আগ্রহ ভাব; (চোর যখন অপহৃত দ্রব্যকে জড়াইয়া ধরে, ছাড়িয়া দিতে চায়না অর্থাৎ মন যখন তৃষিত পদার্থের প্রতি একেবারেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে মনের তখনকার অবস্থাকে উপাদান বলে।)

১০। ভব–তৃষ্ণার বদ্ধমূল অবস্থা হইতে সত্ত্বার উৎপত্তি, তৃষ্ণার বীজ যাহা ভবিষ্যৎ জীবন উৎপন্ন করে, জন্মের বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্ব্বাঙ্ক্ষা, যেমন পিতার ঘরে কন্যা অন্যের বধু হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

১১। জন্ম।

১২। জন্ম হইতে জরামরণাদি।

বুদ্ধ চিন্তা করিলেন মৃত্যু, দুঃখের (১) কারণ কি? অর্থাৎ কিসের উপর দুঃখ

নির্ভর করে? (২) জন্মের উপর নির্ভর করে। জন্ম কিসের উপর নির্ভর করে? (৩) ভবের উপর নির্ভর করে। না-কিছু হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারেনা, শূন্য হইতে জীবন উৎপন্ন হয় নাই, জীবন অবশ্য পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, জীবন একটী নূতন স্রোত নহে, ইহা পূর্ব্ব জীবনের সন্ততি, প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্ম্মসমষ্টির ফলস্বরূপ, নতুবা মানুষের বৈষম্যের ব্যাখ্যা হইতে পারেনা; জন্মান্ত রগত সাধন ও পূর্ব্ব বিকাশের তারতম্যই জন্মগত প্রভেদের কারণ। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোও বলিয়াছেন– "কিছু না হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারেনা, বিশেষতঃ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় বিপরীত গুণ হইতে বিপরীত গুণ উৎপন্ন হয়, জন্মের পর যখন মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম অনিবার্য্য, নতুবা মৃত্যুতে বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যাইত।" [এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, একবিংশতি ভাগ [৮১৪ পৃষ্ঠা]। বুদ্ধের মতে তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের কারণ, প্লেটোও এইমত পোষণ করিতেন। এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার ৪র্থ ভাগের ৭৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদ্বয় (বুদ্ধ ও প্লেটো) যখন স্বাধীনভাবে (একের অজ্ঞাতে অপর) এই একই আশ্চর্য্য সিদ্ধান্তে (পনজর্ন্ম আছে এবং তৃষ্ণার প্রভাবে তাহা ঘটিয়া থাকে) উপনীত হইয়াছেন তখন আমরা (পাশ্চাত্য দেশবাসী) ইহা অসঙ্গত বলিতে ইতঃস্ততঃ করিতেছি।" মহর্ষি গৌতমের ন্যায়দর্শনে উক্ত হইয়াছে "সদ্যোজাত শিশুর স্ত ন্যপানে প্রবৃত্তি, হর্ষ, ভয় ইত্যাদির কারণ পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃতি"। মৃত ব্যক্তির অপরিপূর্ণ তৃষ্ণার এত প্রবল উৎপাদনশীল ক্ষমতা যে তাহা নূতন নামরূপ সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা তারহীন টেলিগ্রাফের সহিত তুলনীয়, দুই ষ্টেশনের মধ্যবর্তী সংযোজন তার না থাকিলেও একটী যন্ত্রে ঈঙ্গিত করা মাত্রই বাতাসের কম্পনের স্রোতে অন্য ষ্টেশনের যন্ত্রে স্পন্দন অনুভূত হয়, তদ্রুপ কর্মজনিত তৃষ্ণাবীজ স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তিতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু বেদ, উপনিষদ্ ও গীতায় বর্ণিত অপরিবর্ত্তনীয় চিরস্থায়ী আত্মা অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হয় ইহা যথার্থ হইতে পারেনা। ভব নির্ভর করে (৪) উপাদানের উপর। আমাদের জীবন ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তির উপাদানের শৃঙ্খল মাত্র, ইহার উপরই ভব নির্ভর করে। উপাদান নির্ভর করে (৫) তৃষ্ণার উপর; যদি তৃষ্ণা না থাকে তবে তৃষিত বস্তু প্রাপ্তির জন্য এত সংগ্রাম হইতনা। তৃষ্ণা নির্ভর করে (৬) বেদনা বা অনুভূতির উপর, যখন আনন্দজনক বা নিরানন্দজনক অনুভূতিক হয় তাহা আস্বাদন করিতে বা অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হয়। বেদনা নির্ভর করে (৭) বস্তুর সহিত স্পর্শের ফলে; স্পর্শ

নির্ভর করে (৮) ষড়েন্দ্রিয়ের উপর; চক্ষু বা দর্শনীয় পদার্থ না থাকিলে স্পর্শ সম্ভব নয়। ষড়েন্দ্রিয় নির্ভর করে (৯) নামরূপের উপর, নামরূপ বা দেহ ও মন না থাকিলে ষড়েন্দ্রিয়ের স্থান হইতে পারে না। নামরূপ নির্ভর করে (১০) বিগত জীবনের প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের উপর যাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অর্থাৎ বিগত জন্মের অবিদ্যাজনিত সংস্কারের দ্বারা এই বিজ্ঞান পুনর্জন্ম ঘটাইয়া থাকে। প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান (১১) পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের উপর নির্ভর করে। সংস্কার বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম (১২) অবিদ্যার উপর নির্ভর কর। তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব তাহাদের সহগামী। *

অবিদ্যা ধ্বংসে সংস্কার ধ্বংস হয়, সংস্কার ধ্বংসে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ধ্বংসে নামরূপ, নামরূপ ধ্বংসে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন ধ্বংসে স্পর্শ, স্পর্শ ধ্বংসে বেদনা, বেদনা ধ্বংসে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা ধ্বংসে উপাদান, উপাদান ধ্বংসে ভব, ভব ধ্বংসে জন্ম, জন্ম ধ্বংসে দুঃখ ধ্বংস হইয়া পরম শান্তিময় নির্ব্বাণ লাভ হয়।

চারি আর্য্যসত্য

১। সংসার চক্রের আবর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু এবং তজ্জনিত দুঃখ আছে, ইহা প্রথম আর্যসত্য।

২। অতৃপ্ত কামনাই দুঃখের হেতু, ইহা দ্বিতীয় আর্য্যসত্য। অগ্নির উপাদান যেমন কাষ্ঠ, জন্মের উপাদান তৃষ্ণা, অগ্নি যতই উর্দ্ধে উঠুক নীচে তৃণকে

** এই দ্বাদশ নিদান অতীত জন্ম, বর্ত্তমান জন্ম এবং ভবিষ্যৎ জন্মের ইতিহাস। প্রথম দুইটি অতীত জন্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ৮/৯/১০ ইহাদের সহগামী। ৩ হইতে ১০ বর্ত্তমান জন্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: ১ এবং ২ ইহাদের সহযোগী। ১১ এবং ১২ ভবিষ্যৎ জন্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: ১ এবং ৭ ইহাদের সহগামী। সর্ব্বশুদ্ধ ২০টি নিদান, পুরুক্তি নিবারণের জন্য দ্বাদশটি নিদান নির্দিষ্ট হইয়াছে। মাতৃপূজায় মানবধর্ম্মে ভবচক্রের চিত্র অঙ্কন করিয়া ব্যাখা করিয়াছি। ডক্টর ওরাভেল অজন্তাগুহা খননকালে বৌদ্ধগণের অঙ্কিত এক ভবচক্রের চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে দ্বাদশ নিদানের নিদর্শন দ্বাদশটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কেন্দ্রে কপোত, সর্প ও শুকরের মূর্ত্তি রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিকৃতিস্বরূপ অঙ্কিত আছে, এই তিনকে কেন্দ্র করিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে, বিস্তৃত বিবরণের জন্য উপরোক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই নিদানতত্ত্ব এত কঠিন যে বোধশক্তির পরিপূর্ণতা না হইলে ইহাতে সম্যক্‌জ্ঞান লাভ হয় না। মহাজ্ঞানী বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, জলসমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তির ন্যায় তিনিও এই বিশাল চিন্তাসমুদ্রের অসহায়।*

অবলম্বন করিয়া থাকে, বায়ুভরে দিগদিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইলে সে উপাদান শূন্য হয়, উপাদান শূন্য হইলে, অগ্নির নির্ব্বাণ হয়, যতক্ষণ দহনীয় কাষ্ঠ মিলিবে ততক্ষণ অগ্নির নির্ব্বাণের সম্ভাবনা নাই, জীবন অগ্নির ন্যায় দাহময়, জন্মে জন্মে লোকান্তরে বাসনা উপাদানের উপর জীবন অবলম্বন করে সে উপাদান বা অবলম্বন বিচ্ছিন্ন হইলে জীবনের নির্ব্বাণ হয়। তৃষ্ণাবিনাশ না হইলে জীবনজ্বালা নির্ব্বাণের সম্ভাবনা নাই, অবীচিত হইতে স্বর্গ, ভূষিত হইতে ব্রহ্মলোকে বাসনা অবলম্বন করিয়া জীবনবহ্নি জ্বলিতে থাকে, বাসনার কণামাত্র বিদ্যমান থাকিলে পুনর্জন্ম ঘটিবেই এবং দুঃখের নির্ব্বাণ অসম্ভব, ইহাই বুদ্ধ ঋদ্ধি বলে জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন। বুদ্ধত্বলাভের পর তিনি যে প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার পদ্যানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল –

"জন্ম জন্মান্তরে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান,
কে কোথা গোপনে আছে, এগৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ,
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবার আর,
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ ভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

৩। দুঃখ নিরোধ তৃতীয় আর্য্যসত্য, দুঃখের কারণ অর্থাৎ তৃষ্ণা ধ্বংস করিতে পারিলে দুঃখের ধ্বংস হইবে।

৪। দুঃখ নিরোধের উপায় অর্থাৎ তৃষ্ণা ধ্বংসের উপায় অর্থাৎ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ চতুর্থ আর্য্যসত্য।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

ইহাকে মধ্যপথও বলা হয়, একদিকে শরীর নিগ্রহপূর্ব্বক বৈদান্তিক ঋষিদের কৃচ্ছ্রসাধ্য কঠোর তপশ্চরণ, অন্যদিকে হীন, ইতরজনভোগ্য, অনার্য্য, অনর্থকসংযুক্ত কাম্যবস্তুর উপভোগ, এই উভয়অন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানব জাতির নিকট বুদ্ধ দুঃখের বিনাশক এবং শান্তি ও নির্ব্বাণমুক্তির যে অব্যর্থ মধ্যপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই ঃ-

১। **সম্যক্ দৃষ্টি**–দ্বাদশনিদান তত্ত্ব ও আর্য্য সত্যজ্ঞান, অনিত্যতা ও অনাত্মজ্ঞান ও কুশলাকুশলের কারণ জ্ঞান ইহার অন্তর্গত।

২। **সম্যক্ সঙ্কল্প**–অসদ্দেচ্ছা, নিম্নলক্ষ্য ও পাপতৃষ্ণাকে বিপরীতভাবে অর্থাৎ সদিচ্ছা, উচ্চলক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা দমন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অনাসক্তি ও আত্মত্যাগের সঙ্কল্প (নৈষ্ক্রম্য সঙ্কল্প); কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া সমগ্র জীব জগতের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করার সঙ্কল্প অব্যাপাদ সঙ্কল্প এবং কোন প্রাণীর প্রাণনাশ না করার জন্য সঙ্কল্প অহিংসা সঙ্কল্প।

৩। **সম্যক্-বাক্য**–মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, পরুষবাক্য এবং বৃথাগল্প হইতে বিরতি।

৩। **সম্যক্-কর্ম্মান্ত**–প্রাণীহত্যা, পরাস্বার্থপহরণ, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য সেবনে বিরতি ও সকল প্রাণীর প্রতি কায়মনোবাক্যে হিতজনক কার্য্য।

৫। **সম্যক্ আজীব**–অস্ত্র, বিষ, মাদকদ্রব্য, হত্যার্থ প্রাণী বাণিজ্য, দাসবাণিজ্য ও অন্যান্য পাপ ব্যবসায় হইতে বিরতি ও সকল জীবের প্রতি অহিংসা, পরিপূর্ণ সাধু উপজীবিকা।

৬। **সম্যক্ ব্যায়াম**– (১) উৎপন্ন পাপের বিনাশ, (২) অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদন, (৩) উৎপন্ন পুণ্যের সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন এবং (৪) অনুৎপন্ন পুণ্যের উপাদনের জন্য বীর্য্য ও অধ্যবসায়। সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় পাপ হইতে বিমুক্তি ও পুণ্যকার্য্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা; আত্মোন্নতি ও আত্মনির্ভরতা বৌদ্ধ বীরত্বের উদ্দেশ্য। ইন্দ্রের ন্যায়, অর্জ্জুনের ন্যায়, হিটলারের ন্যায় সাহসী ও বিজয়ী ব্যক্তি হইতে আত্মজয়ী, ইন্দ্রিয়বিজয়ী ব্যক্তিই সমধিক বীর।

৭। **সম্যক্ স্মৃতি**–যোগাভ্যাসের অন্যতম নাম। (১) ৩২টি উপাদনে নির্ম্মিত শরীর সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ দর্শন হেতু ইহার অসারত্ব জ্ঞান ও তসম্বন্ধে স্মৃতি। (২) বাহ্যজগতের সহিত ষড়েন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষামূলক যে বেদনার উৎপত্তি হয়, পুনঃ পুনঃ তাহার কারণ অনুসন্ধান, ইহাদের অস্থায়িত্ব অনুভব ও তৎসম্বন্ধে স্মৃতি। (৩) চিত্তের প্রবাহ সম্বন্ধে চিন্তা, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদনে তাহা স্থির ও নির্বাণোন্মুখী করার স্মৃতি। (৪) আত্মবাদ, সন্দেহ, বাহ্যনুষ্ঠানে নির্ভরতা, ইন্দ্রিয়ভোগ, বিদ্বেষভাব, সংসারে বাঁচিয়া থাকার প্রবৃত্তি, স্বর্গ সুখের কামনা, মান, মনের একাগ্রতা সাধনে সামর্থ্যের অভাব এবং অবিদ্যা–এই দশপ্রকার বন্ধন যাহা আমাদের, পুনর্জন্ম ঘটায় এবং বিষয় কামনা, হিংসা, দ্বেষ, আলস্য ও জড়তা, অহঙ্কার এবং সন্দেহ এই পাঁচটী আবরণ যদ্বারা

সত্য আবৃত্ত থাকে তৎসম্বন্ধে স্বাভাবিক মনোবৃত্তি স্মরণপূর্ব্বক মনকে সর্ব্ব প্রকার অপবিত্রতা হইতে রক্ষার জন্য ধ্যান। জগৎ ও আত্মবিশ্লেষণ পূর্ব্বক সদা সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সমাধিতে সুস্থির ও সংযত করা ও আত্মজ্ঞান ও চতুরার্য্যসত্য-সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য স্মৃতিমান থাকিয়া সৎগুরুর শিক্ষাধীনে সত্যজ্ঞানের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক তাহা উপলব্ধির যোগপ্রক্রিয়া এবং উচ্চতর সমাধির জন্য মনকে প্রস্তুত করাই সম্যক্‌স্মৃতি।

৮। **সম্যক্ সমাধি**–স্তরে স্তরে বুদ্ধনির্দ্ধারিত নিয়মের সাধনা, যদ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, অলৌকিক জ্ঞান জন্মে, তৃষ্ণা সম্যক্ ধ্বংসের ফলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অভিজ্ঞ যোগীর তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষাধীনে এই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

বুদ্ধ মনোরোগের অব্যর্থ চিকিৎসক, ইহার সম্যক্ প্রতিকারের জন্য তিনি অষ্টাঙ্গিকমার্গরূপ অমোঘ ব্যবস্থা দিয়াছেন, তৃষ্ণানল হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য এইভাবে সাধনা ও চেষ্টা করিতে তিনি মানবজাতিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

বুদ্ধের ধর্ম্মনীতি

বুদ্ধের ধর্ম্মমত একটী গাথাতেই একত্রীভূত আছে–"সকল পাপ হইতে বিরতি, নিজের ও অপরের মঙ্গলের জন্য কুশল উপাদন, কুশলকর্ম্ম সম্পাদন এবং মনের মলিনতা (লোভ দ্বেষ ও মোহ) বিশোধনপূর্ব্বক ইহাকে নির্ম্মল ও নিষ্পাপ করা"। প্রাণী হত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন এবং মাদক দ্রব্য সেবনে বিরতি এই পঞ্চশীল গৃহীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এই পঞ্চনীতি অন্যান্য ধর্ম্মের উপদেশ হইতে কিছু পৃথক না হইলেও শীলপালনের সঙ্কল্পকে দৈনিক নবীভূত করা অন্যান্য ধর্ম্মে অপ্রচলিত ও অজ্ঞাত। ত্রিশরণ * গ্রহণ করিবার সময়, দান ও অন্যান্য প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানের সময়, স্মৃতি ও সমাধির প্রাক্কালে এই সঙ্কল্পকে স্বয়ং বা ভিক্ষুর নিকট পুনরাবৃত্তি করিতে হয়।

---

* বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ অর্থাৎ বুদ্ধ সম্যক্‌জ্ঞানী, শাস্তা ও প্রথপ্রদর্শক। ধর্ম্ম যাহাতে ন্যায় ও সত্যের অলঙ্ঘনীয় নীতি ও সংসারে থাকিয়া মনের সম্যক্ শান্তি অনুভবের পথ ব্যবস্থিত আছে, এবং সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতির শিক্ষক ও আদর্শ সঙ্ঘকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা। এই তিন আদর্শকে গ্রহণ করিলেই বৌদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়।

১ম, ৩য় ও ৫ম শীলে বুদ্ধের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হত্যা, ব্যভিচার (ইন্দ্রিয়শক্তির প্রশয়) এবং মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, পৃথিবীর দুঃখের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগের জন্য দায়ী। উচ্চস্তরের গৃহীগণের জন্য সাময়িকভাবে আটটীশীল পালনের বিধান আছে, সাধক মাত্রই ব্যবস্থিত নিয়মে সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রীভাবনা, করুণাভাবনা, [মনের যে অবস্থায় অপরের দুঃখে দুঃখ উপস্থিত হয়, অপরের দুঃখ বিমোচনে বাসনা জন্মে], মুদিতাভাবনা [যেই অবস্থায় অপরের সুখে সুখ অনুভব হয়, সুখ অনুমোদন করা হয়], উপেক্ষা ভাবনা [যশঃ, অপযশ, নিন্দাপ্রশংসা ইত্যাদি সকল অবস্থায় অনুদ্বিগ্নমনা এবং বিগতস্পৃহ হইয়া শান্ত ভাবে অবস্থান করা] এবং অনিত্যতা ভাবনার ফলে প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তির মার্গে উপনীত হইতে পারা যায়। বুদ্ধ শ্রামণগণের জন্য ১০টি শীল এবং ভিক্ষুর জন্য ২২৭টি শীল * নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বুদ্ধ মনোরাগের অব্যর্থ চিকিৎসক। শীলপালন রোগীর পথ্যপালনের সহিত তুলনীয়, ভাবনা মনোরোগের ঔষধ এবং দান অর্থাৎ কুশলকর্ম্ম সম্পাদন, পরসেবা, সম্পত্তি, সদুপদেশ, জ্ঞানদানাদি ইহার অনুপান। শীলপালন দুঃখের বিনাশক এবং ভাবনা জ্ঞানের বিকাশ। এই সমুদয় নীতি বৌদ্ধধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

অহিংসা বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ নীতি। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রোনাল্ডসে কলিকাতা ধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধাস্থি প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় বলেন–"অহিংসা এই অমূল্যবাণীর নিকট মানবহৃদয়ের রুচিরুদ্ধ, বর্ব্বরোচিত এবং ভীষণ আকাঙ্ক্ষাসমূহ–লোভ, দ্বেষ ও মোহ, যাবতীয় অন্যায় অন্তর্হিত

** বৃক্ষ, ইহার শাখা, পত্র ও ফল ছেদন হইতে বিরতি ২২৭টি শীলের অন্তর্গত। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ বৃক্ষলতার চেতনা ও অনুভব শক্তি সম্বন্ধে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের বা দীক্ষার কিংবা সন্ন্যাসীগণের চলাফেরার কোন নির্দ্দিষ্ট আইন কানুন দৃষ্ট হয়না, কিন্তু বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা বৌদ্ধভিক্ষু কঠোর নিয়মের অধীন। ২০ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে এবং পিতামাতার বা স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে কিংবা কুষ্টগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত , ক্ষয়রোগী, মৃগরোগী বা অপরাধী অথবা বিকলাঙ্গ হইলে কিংবা কোন চাকরি থাকিলে বৌদ্ধ শাসনে অর্থাৎ সঙ্ঘে গ্রহণ নিষিদ্ধ। অষ্টশীলধারী গৃহীসাধক, দশশীলধারী শ্রামণ এবং ভিক্ষু দ্বি-প্রহরের পর আহার করিতে পারেন না। অষ্টশীলধারী গৃহীসাধক, পঞ্চীলধারী গৃহীর সম্মানার্হ। শ্রামণ এবং ভিক্ষু পিতামাতার প্রণম্য। বয়স নহে, গুণ এবং ভিক্ষুত্বে বরণের তারিখ অর্থাৎ জ্ঞান ও গুণ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের পরিমাপক।*

হইয়া যায়, পৃথিবীতে বর্ত্তমানে বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময় প্রভাবের, অমূল্য ও কমনীয় অহিংসানীতি গ্রহণ করিবার একান্ত আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে।"

জীবের প্রতি অপার করুণাবশে বুদ্ধ মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, লোকে তাহা অনুসরণ করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মকে ভেলার সহিত তুলনা করিয়াছেন যাহা অবলম্বনে ভবনদী উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে সকলের জন্য আশা প্রদান করা হইয়াছে, কেবল সদুদ্দেশ্য, হৃদয়ের সরলতা ও ন্যায়পরতার জন্য অতৃপ্ত পিপাসার আবশ্যক। মানবজাতির স্বার্থ ও মঙ্গলবিধানই প্রকৃত বৌদ্ধের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য। এইভাবে ব্যক্তিত্বের বন্ধন ভাঙ্গিয়া জীবজগতের একত্ব বা মমত্ব অনুভবের দ্বারা আমিত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রেমে 'আমি'র স্থান নাই, স্বার্থের অস্তিত্ব নাই, 'আমি' যখন লুপ্ত হইবে তখনই আমার মুক্তি; 'অনাত্ম' বা 'আমি নাই' ইহাই এই প্রেমের পরিণতি। স্বামী বিবেকানন্দ * বলিয়াছিলেন–"ব্রহ্ম সব্বভূতে বিরাজমান, নরনারায়ণের সেবাই প্রকৃত ধর্ম্মচর্চ্চা, বেদান্তের জ্ঞান, আত্মনির্ভরতা, আত্মত্রাণ, দার্ঢ্য একক জগতের আদর্শ ধর্ম্মনীতি হইতে পারে না, তাহার সহিত ভগবান বুদ্ধের সদয় হৃদয় চাই।" "পাপ হইতে বিরত হও" বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু এই অকর্মক শিক্ষা দেয়না "হৃদয় নির্মল কর, পরসেবা কর" বুদ্ধ এই সকর্মক শিক্ষাও দিয়াছেন। জগতে সেবাধর্ম্ম বুদ্ধেরই সৃষ্টি; সকল প্রাণীতে নিজের স্বরূপদৃষ্টি অর্থাৎ আমিত্ব ধ্বংস বৌদ্ধধর্মের শেষ লক্ষ্য। মনে করিতে হইবে জীবের সেবার জন্যই তোমার জন্ম, অপরের দুঃখভার তোমার স্কন্ধে লইয়া উপশম করিতে হইবে। যদি সকল প্রাণীর সহিত তোমার একাত্বজ্ঞান না হয় এবং যদি তুমি আমিত্বের অসারত্ব অনুভব করিতে না পার তবে তাহা কিরূপে পারিবে? মানজাতিকে বুদ্ধ ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাই একমাত্র জীবনসমস্যা সমাধান করিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন–"সহস্রবৎসর ধরিয়া যে মহান তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসাইয়াছিল তাহার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমরা এক মহামহিমাময় মূর্ত্তি দেখিয়া থাকি, তিনি আমাদেরই গৌতম শাক্যমুনি, আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, জগৎ এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই, তিনি কর্ম্মযোগীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" [ভারতে বিবেকানন্দ, ২১১ পৃষ্ঠা।]

---

* স্বামী বিকেকানন্দের Speeches and writing ২৪৪, ৪২৬, ৫৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ বৌদ্ধধর্ম্মে একত্রে সম্মিলিত, এ তিনের একত্র সম্মিলন না হইলে মুক্তি হইতে পারে না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৩১৮ সালের পৌষ সংখ্যায় ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন–"বৌদ্ধধর্ম্মের ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে। ... অজ্ঞানে ভ্রমক্রমে নাম উচ্চারণ করিলেও মহাপাপী মোক্ষ পায়, এই বিশ্বাস মানুষের পুণ্য চেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম একদিকে যেমন ত্যাগের ধর্ম্ম, অন্যদিকে তেমনই প্রেমের ধর্ম্ম, বিশ্বব্যাপী প্রবেশের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন।"

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রত্যেককে করিবার, বলিবার এবং ভাবিবার স্বাধীনতা দিয়াছে, বুদ্ধ বলিয়াছেন–"কেহ কিছু বলিয়াছে শুধু ইহাতে তুমি বিশ্বাস করিবেনা, প্রাচীনকাল হইতে প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিতেছে জ্ঞানীগণ কিছু বলিয়াছেন বা লিখিয়া গিয়াছেন, দৈবজ্ঞানে বা আধ্যাত্মিক অনুভবে কেহ কিছু বলিয়াছেন, বা কোন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাই বলিয়া তাহা বিশ্বাস করিবেনা যাহা শুনিয়াছ তাহা তোমার সৎবিবেক ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইলেই তাহা গ্রহণ করিবে। এই জন্যই বুদ্ধের ধর্ম্ম "এহিপাস্‌সিক" ধর্ম্ম, অর্থাৎ 'এস, দেখ, তৎপরে গ্রহণ করিও।' বুদ্ধ বলিয়াছেন, তিনি ও পূর্ব্ব বুদ্ধগণ মাত্র শাস্তা, প্রত্যেকেরই অপ্রমত্তভাবে এবং বীরত্বের সহিত উপদেশ অনুসরণ করিতে হইবে। [গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্বে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে পৃথিবীতে আরও ২৭ জন বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।]

বুদ্ধের মতে জন্মদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম্ম দ্বারাই যে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে, কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়। বুদ্ধের মতে তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি সত্য, প্রেম, ক্ষমা, দয়া অভ্যাস করিয়াছেন, যিনি সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় এবং পাপকলঙ্ক হইতে বিনির্ম্মুক্ত। বুদ্ধ প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সম্মান করিতেন। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত, ইহা কোন জাতি সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নহে, ইহা মানব ধর্ম্ম বা মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম। সত্য, প্রেম, ক্ষমা, দয়া, পরোপকার, আত্মসংযম, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সৎগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই প্রকৃত বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বোত্তম মঙ্গল শিক্ষা দেয়, সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রীপূর্ণ, পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও জ্ঞানময় জীবন যাপন করিয়া এই জীবনে, এই পৃথিবীতেই চরম ও পরমজ্ঞান, এবং শান্তিময় নির্ব্বাণলাভ শিক্ষা দেয়। ধর্ম্মপদে বুদ্ধ বলিয়াছেন–"কেহ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ বা অবিবেচনাপূর্ব্বক

তোমার অনিষ্ট করে তাহাকে তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভালবাসা ফিরাইয়া দাও, তাহা হইতে যত অধিক অন্যায় আসে তত অধিক উপকার তাহাকে ফিরাইয়া দাও"। অন্যায়কারীর প্রতিও অন্যায় করা বৌদ্ধধর্ম্মে নিষিদ্ধ।

জীবন একটা স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া ইহার প্রকৃত স্বভাব উপলব্ধি জীবনের লক্ষ্য। সম্যক্ সম্বোধি ও সম্যক্ পরিপূর্ণতা অর্জনই বুদ্ধের শিক্ষা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানলাভ তাঁহার জীবনে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল, জীবন এমন মহনীয়, হৃদয় এত পবিত্র, মন এত গভীর, ব্যক্তিত্ব এতই মধুর ও সম্ভ্রমউদ্দীপক এবং জনসেবা এতই নিঃস্বার্থ যে বুদ্ধব্যতীত জগতে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। তাঁহার শিক্ষা সূর্য্যরশ্মি সদৃশ প্রভাময়, ইহা হৃদয়কে আলোকিত করে, অহঙ্কার বিদূরীত করে, মনকে পবিত্র করে, সর্ব্বত্র আলো প্রদান করে; গুণের উপাসক তাঁহার জীবনের পবিত্রতাকে সম্মান করেন, জ্ঞানের উপাসক তাঁহার জ্ঞানের গভীরত্ব উপভোগ করেন, সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার বিশ্বপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া যান, ধর্ম্মের উপাসক তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতায় চমৎকৃত হন, দুঃখগ্রস্ত মানবজাতির বুদ্ধই একমাত্র আশ্রয়। জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ হইবার জন্য ব্যগ্র সাধনা ও প্রয়াস তাঁহার শিক্ষার উদ্দেশ্য। বুদ্ধই একমাত্র শিক্ষক যিনি দৈবজ্ঞান বা মনের প্রেরণা বা অনুভব হইতে লব্ধ জ্ঞান জগতে প্রচার করিয়াছেন। যাঁহার জীবনের পরিপূর্ণতা প্রয়াসী, সম্যক্ জ্ঞানার্জ্জন ও জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছুক এবং প্রকৃত সুখ ও শান্তির অভিলাষী, তাঁহারা বুদ্ধের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন এবং নিজে নিজেই নির্ব্বাণের শান্তি উপভোগ করিতে পারেন।

<u>বুদ্ধ প্রচার করিয়াছেন</u>

(১) কর্ম্মফলের অমোঘ বিধান বা আইন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(২) বিশ্বে সকল পদার্থের অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনের নাছোড়বান্দা বিধান রহিয়াছে, ব্যোম এবং নির্ব্বাণ ব্যতীত কিছুইতে চিরস্থায়ী নহে, সকলই অনিত্য, সমস্ত সংস্কারই অস্থায়ী।

(৩) শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয় কোন আত্মা নাই, এবং মৃত্যুর পর আত্মা দেহান্তর পরিগ্রহ করেনা।

(৪) নির্ব্বাণই চরম লক্ষ্য।

কর্ম্মফল

কর্ম্মই আমাদের আনন্দ বা দুঃখ আনয়ন করে। কর্ম্মের নির্ভুল প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদের কার্য্যের যথোপযুক্ত পরিমাণে পুরস্কার বা শাস্তি প্রাপ্ত হই, এক চুল পরিমাণে কম বা বেশী হইতে পারে না। সৎকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম যতই গোপনে করা যাক না কেন নিশ্চিত তুলা দণ্ডের পরিমাপে কেহই রক্ষা পাইতে পারে না। বুদ্ধের উপদেশ এই যে যেমন বীজ বপন করিবে ফলও তদনুরূপ হইবে, বালকের কর্ম্মফল যুবার জীবনে, যুবকের কর্ম্মফল বৃদ্ধের জীবনে প্রতিফলিত হইবে, সেইরূপ তোমার ঐহিকের কর্ম্মফল পারত্রিক জীবনে প্রতিফলিত হইবে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল যেখানে যাও, সমুদ্রে প্রবেশ কর বা গিরিগুহায় লুক্কায়িত থাক কিছুতেই তাহা হইতে নিস্তার নাই, তোমার পাপের ফল যেমন দুঃখ ভোগ, তোমার পুণ্যের ফল ভাগীও তুমি, বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু যেমন তোমাকে অভ্যর্থনা করে সেইরূপ তোমার পুণ্যফল লোক হইতে লোকান্তরে তোমাকে অনুসরণ করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিবে। টেলার সাহেব তাঁহার প্রিমিটিভ কাল্‌চার নামক পুস্তকের ২য় ভাগের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন -"বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মবাদ যাহা জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের ভাগ্য আইনের বিচারে নহে কার্য্যকারণের অমোঘ প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, গতজীবনের কর্ম্মফলে বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মফলে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে, ইহা পৃথিবীর নীতিতত্ত্বের এক আশ্চর্য্য আবিস্কার।"

বৌদ্ধগণ শুধু অদৃষ্টবাদী নহেন, তাহারা ইচ্ছাশক্তিরও সমর্থনকারী। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলকে অদৃষ্ট বলা হয়, ইহা আমাদের স্বভাব গঠন করে, ইহজন্মে আমরা শুধু পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করি, এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক, এই ভ্রমবিশ্বাস জীবনকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেয়; আমরা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলকে এই জন্মের কর্ম্মের দ্বারা প্রতিরোধ ও নিষ্ক্রিয় করিতে পারি। মাধ্যাকর্ষণ সকল পদার্থকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু আমরা প্রকৃতির শক্তিকে বশে আনিয়া উর্দ্ধে, আকাশে উঠিতে পারি; কাহারো শরীরে পৈতৃক রোগের বীজানু থাকিলে যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক ইহাকে অকর্ম্মণ্য করিতে পারা যায় নতুবা সমর্থনকারী শক্তির সহযোগে রোগ প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। প্রফেসর সিল্‌ভান লেভী বলেন - "সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ হইতে নিম্নতম নরকের সমস্ত জীব এক মহান কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত এবং সকলেই কর্ম্মের একই বিধানে নিয়ন্ত্রিত। কোন কর্ম্ম একবার

সম্পাদন করিলে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহার নৈতিক ফল ফলিতে থাকিবে, এই কর্ম্মের বিধান অখণ্ডনীয় কিন্তু জ্ঞান, প্রেম, উদারতা এই অন্ধশক্তিকে প্রতিরোধ করিয়া নির্ব্বাণের শান্তির আশা প্রদান করিতে পারে, ইহা জীবনকে সজীব ও আশাপ্রদ করে ইহা বৌদ্ধসভ্যতার এক প্রধান দান।" বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম্মফলবিশ্বাসী মানুষকে কর্ম্মী ও বীর্য্যবান হইতে শিক্ষা দেয়, সেইজন্য ইহা আত্মোন্নতি বা অপরাধঙ্খালনের জন্য দেবদেবীর অনুগ্রহের অপেক্ষা রাখেনা।

হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য

হিন্দুধর্ম্মে এক বিশ্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর কল্পনা করা হইয়াছে, বিশ্বের যাবতীয় জীব সেই পরমাত্মার অংশ, জীবাত্মা পাপকলঙ্কিত হইলেও সাধনা ও সুকৃতির ফলে পরিশেষে পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। এই কল্পনার ফলে দুইটি ধর্ম্মনীতি গৃহীত হইয়াছে। – একটি জীবের মৃত্যুর পর জীবাত্মা দেহান্তর পরিগ্রহ করে, এবং ইহা দেহ হইতে ভিন্ন। দ্বিতীয়টি – সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত, একে তিন, তিনে এক, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং শিব সংহার কর্ত্তা, আবার মঙ্গলদাতা। এতদ্ব্যতীত বহুদেবদেবীর কল্পনা করা হইয়াছে, সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় ব্রহ্মাকে পিছনে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, ব্রহ্মার পূজা হয় না, কিন্তু ব্রহ্মার স্ত্রী অগ্নি বা শক্তি, বিষ্ণু, শিব এবং বহু দেবদেবীর পূজা সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস বা কল্পনার স্থান নাই, এই সমুদয় প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও সম্যক-দৃষ্টির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। বৌদ্ধমতে, আত্মা দেহান্তর পরিগ্রহ করে না এবং ইহা অবিনশ্বর বা ক্ষয়বৃদ্ধিহীন নহে। আমি প্রথমে আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শাশ্বত আত্মা

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয় আত্মার কল্পনা ন্যায়শাস্ত্র বা বিজ্ঞানমতে অরক্ষণীয়। বিশ্বের বিচিত্র বিধানে জড় পদার্থের নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহা স্বীকৃত বিষয়। বুদ্ধ এ বিষয়ে আরো অগ্রসর হইয়াছেন এবং বলেন, এই পরিবর্ত্তনের আইন অন্তঃশরীরেও কার্য্য করিতেছে, দেহ ও মন লইয়া জীব, এই আইন শুধু শরীরের উপর কার্য্যকরী, মনের উপর ইহা কার্য্যকরী

নহে, ইহা অযৌক্তিক। বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নহে তাহা নয়, যন্ত্রদ্বারা প্রমাণ করিতে পারেনা বলিয়াই বিজ্ঞানে ইহা গৃহীত হইতেছে না। মন প্রতিমূহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনের আইনের উপর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বুদ্ধের অনাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত। যখন পরিবর্ত্তন প্রকৃতির ধর্ম্ম এমন কিছু থাকিতে পারেনা যাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে, যেমন, প্রাকৃতিক শক্তি মাধ্যাকর্ষণ হইতে কিছুই বাদ পড়ে নাই। জীবন নামরূপের সমষ্টি অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারিটি একত্রযোগে নাম এবং চতুর্ভূতের সম্মিলনে দেহ, এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিই জীবন। ইহার কোনটারই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না এবং দৃশ্য-রূপ ব্যতিরেকে অদৃশ্য নামের অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব নয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র আত্মা থাকিতে পারে না যাহা অনুভব করে বা অন্য শরীরে প্রস্থান করে। শরীর হইতে আত্মা পৃথক হইলে চক্ষু বা কর্ণ না থাকিলেও তাহা রূপ দর্শন বা বাক্য শ্রবণ করিতে পারিত। সাংখ্যদর্শনমতে পুরুষ অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তির সহিত প্রকৃতি বা ভূতাদির সম্মিলনে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়, সাঙ্খ্যে ও গীতায় এই পুরুষকে চৈতন্যময় বলা হইয়াছে। সেই প্রাকৃতিক শক্তি চৈতন্যময় না হইলেও চৈতন্যের আধার বলিয়া অর্থাৎ ইহার সহিত ভুতচতুষ্টয়ের সম্মিলনে চৈতন্য উৎপন্ন হওয়ায় ভগবদুক্ত আর্য্যঋষিগণ ইহাকে চৈতন্যময় বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। চার্ব্বাকদর্শনমতে গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতির সংযোগে যেমন মাদকতা গুণবিশিষ্ট সুরার উৎপত্তি হয়, চতুর্ভূতের সহিত প্রাকৃতিক শক্তির সংযোগে সেইরূপ চৈতন্যের উৎপত্তি হয় ; চতুর্ব্বেদান্ত র্গত পঞ্চদর্শী বিবেকের ১৯ হইতে ২২ শ্লোকে ইহা সমর্থন করা হইয়াছে, প্রকৃতির পরিণামের ফলে যে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ইহা ডারউইন, স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, পরমাণুতত্ত্ব -প্রচারক মহর্ষি কনাদ প্রভৃতি প্রচার করিয়াছেন ; প্রকৃতির সহিত প্রাকৃতিক শক্তি যুক্ত হওয়ায় চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, এই চৈতন্যের বা জীবাত্মার শরীর হইতে পৃথক সত্ত্বা বা অবস্থিতি নাই। প্রাকৃতিক শক্তিকেই ঋষিগণ যদি আত্মা বা পরমাত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন সেই অর্থে ইহা চিরস্থায়ী হইতে পারে এবং ভূতচতুষ্টয়ের ও বিশ্বশক্তির বা বিশ্বশক্তির অংশের সমবায়ে যে জীবাত্মা সৃষ্ট হয় সেই বিশ্বশক্তির অংশও চিরস্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু জীবাত্মা অন্যশরীরে প্রবেশ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করে বা সেই বিশ্বশক্তি চৈতন্যময় ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মে অস্বীকার করা হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মমতে জীবন পূর্ব্বকথিত ১২টি নিদানের প্রক্রিয়ার ফল এবং দেহ ব্যতীত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা। ঘরের ছাদ, দেওয়াল, দরজা ইত্যাদিকে লইয়া যেমন আমরা ঘর নাম দিয়া থাকি পঞ্চস্কন্ধের মিলনকে আমরা "আমি" বলিয়া থাকি, সপ্তবর্ণের একত্রসংযোগে যেমন সাদা রং এর সৃষ্টি করে পঞ্চস্কন্ধের মিলন জনিত আত্মাও সেইরূপ। আবার দুগ্ধ হইতে দধি, নবনীত, ঘৃত উৎপন্ন হয়, যদি কেহ বলেন যাহা দুগ্ধ তাহা দধি, তাহা নবনীত, তাহাই ঘৃত, তবে তিনি তাহা ঠিক বলেন না, দধি দুগ্ধ নহে এবং দুগ্ধ হইতে পৃথকও নহে, কেননা দুগ্ধকে আশ্রয় করিয়া তৎসমুদয় উদ্ভুত হইয়াছে। এই প্রকারে ধর্ম্মসন্ততি বা বস্তুধর্ম্মপ্রবাহ বস্তুতে সম্মিলিত হয়, যাহা নিরুদ্ধ হয় ঠিক তাহাই উৎপন্ন হয় না, নিরুধ্যমান বস্তুর ধর্ম্মপ্রবাহ উৎপদ্যমান বস্তুতে সম্মিলিত হয়, এইজন্য চরমবিজ্ঞানে ইহা গৃহীত হয় যে, যে পরজন্মে উৎপন্ন হয় সে সেও নহে, অন্যও নহে। অদ্যকার 'আমি' অতীতের কর্ম্ম ও জ্ঞানসমষ্টির ফলস্বরূপ এবং তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের যেই সম্বন্ধ এই জন্মের সহিত পরজন্মেরও সেই সম্বন্ধ। গতকল্যের "আমি" এবং অদ্যকার "আমি" এক "আমি" হইলেও তেমন পুরাপুরি এক নহে। কর্ণফুলী নদীর জল, তল, কুল, গতি প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইলেও বাহ্যদৃষ্টিতে ইহা যেমন চিরস্থায়ী, বেদান্ত ও গীতার দৃষ্টিতেও আত্মা চিরস্থায়ী, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে তাহা সত্য হইতে পারেনা। কয়েকজন বিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিকও বুদ্ধের মত অনুসরণ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স তাঁহার টেক্সবুক অব সাইকোলজির ২০১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন –"গতকল্যের 'আমি' এবং অদ্যকার 'আমি' এক 'আমি' বলিলে ভুল করা হয়, কেননা তখন ক্ষুধার্ত্ত, এখন পরিপূর্ণ, তখন নিদ্রিত, এখন জাগরিত, তখন অল্পবয়স্ক, এখন অধিকবয়স্ক, তখন শান্ত, এখন ক্রোধান্বিত।" তিনি ক্ষণিক-বিজ্ঞাতা ব্যতীত কোন নির্ব্বিকার আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন প্রত্যেক ক্ষণিক বিজ্ঞাতা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিকবিজ্ঞাতার নিকট হইতে তাহার অতীত স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞান সমষ্টি ধার করিয়া লয়। দার্শনিক হিউমেরও এইমত, তিনি আত্মাকে নিত্য স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে আত্মা ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানের পরম্পরামাত্র, একটী প্রত্যয়ের পর অন্য একটী প্রত্যয় আসিয়া থাকে, অন্নভোজনরূপ প্রত্যয়ের পর ক্ষুধানিবৃত্তি নামক প্রত্যয় উপস্থিত হয়, এই মাত্র। উভয় প্রত্যয়ই ক্ষণস্থায়ী,

একের সহিত অন্যের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধব্যতীত অন্যকোন রূপ সম্বন্ধ নাই। প্রফেসর টিচেনারও তাঁহার 'আউটলাইন অব সাইকোলিজি' নামক পুস্তকে চিরস্থায়ী আত্মা স্বীকার করেন নাই, সুতরাং বুদ্ধের অনাত্মবাদ পাশ্চাত্যদার্শনিকগণও সমর্থন করিয়াছেন। জার্মানীর সুবিখ্যাত দার্শনিক শোফেনহওয়ার বলিয়াছেন–"যদি আমি আমার নিজের দর্শনের ফলকে পরিমাপ ধরিয়া লই, বাধ্য হইয়া অন্যান্য সকল দর্শন হইতে আমি বৌদ্ধদর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করিব"। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত রেনান্ তাঁহার খৃষ্টচরিতে লিখিয়াছেন–"জগতে ঈশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পুরুষ আর কেহ নাই সম্ভবতঃ শাক্যমুনিকে ছাড়িয়া দিলে (Sacyamuni perhaps excepted,)"। সুতরাং জাগতিক পদার্থের নিরন্তর পরিবর্ত্তনের আইনের দ্বারা সমর্থিত এই মহামানবের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলব্ধ বাক্যের সহিত ঋষিগণের সম্ভাবিত অনুভব তুলনা হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শনের ব্রহ্ম প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবাত্মারূপে দুঃখময় সংসারে সাধ করিয়া দুঃখভোগ করিতে আসিবেন কেন? জন্মে জন্মে পশুযোনী, নরকযোনী প্রভৃতিতে অনন্ত দুঃখকে বরণ করিবেন কেন? সর্ব্বব্যাপী মুক্ত আত্মার সীমাবদ্ধ ও বদ্ধ হইবার প্রবৃত্তিইবা জন্মিবে কেন? অনন্তজ্ঞানময় ব্রহ্ম অবিদ্যা বা মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইবেন কেন? আত্মা যে চিরস্থায়ী ও দেহান্ত র পরিগ্রহ করে আপ্তবাক্যব্যতীত তাহার কোন প্রমাণ নাই। আত্মার অনিত্যতা লোকচক্ষুর সমক্ষে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মের প্রথমেই ত্রিশব্দ বিশিষ্ট বাক্য "অনিচ্চা, দুক্খা, অনাত্তা" সংযোজন করিয়াছেন।

মূর্ত্তিপূজা এবং আদর্শপূজা

মূর্ত্তিপূজা এবং দেবতার প্রীতি বা আশীষের জন্য পশুবলি মিথ্যাদৃষ্টির ফল; যদি ঈশ্বর বা কালী জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রাণদাতা হন তবে তাঁদের সন্তানের প্রাণনাশে বা রক্তপানে তাঁহার সন্তুষ্ট হইবেন অসম্ভব! হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয় যেই পশুকে বলি দেওয়া হয় সুকৃতির ফলে সেই পশু স্বর্গের গমন করে; চার্ব্বাক বলেন পশুবলি দিয়া যদি ইহাকে স্বর্গে পাঠান যাইতে পারে তবে যজমান তাহার পিতাকে যজ্ঞে বলি দিয়া কেন স্বর্গে পাঠায়না? মসলা বাটিয়া রাখিয়া স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখাইয়া পশুবলি দেওয়া অজ্ঞ যজমানের উপর পুরোহিতগণের ছলনা মাত্র। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের হিতার্থেই শাস্ত্রের বলির বিধান করা হইয়াছে।

বুদ্ধ বলেন, অষ্টমার্গ অনুসরণ করিয়া পবিত্র জীবন যাপনেই মুক্তিলাভ ঘটে, আমিষ পূজা বা মূর্ত্তিপূজা দ্বারা নহে। অবশ্যই বৌদ্ধগণ বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা করেন, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের "পুত্রং দেহি, ধনং দেহি" ইত্যাদি বর প্রার্থনা করা হয়না। এই কল্পে বুদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও আদর্শ মহাপুরুষ এবং সীমাহীন দয়ার সাগর বলিয়া বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি তাহাদের মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্মৃতি স্থাপন করে। মানবজাতির মধ্যে বুদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মুক্তির পথ-প্রদর্শক বলিয়া পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের অধিক লোক এবং দুঃখ যাঁহারা যানেন তাঁহারা বুদ্ধের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি প্রদর্শন করেন। বুদ্ধ প্রতিমাকে পুষ্প প্রদীপ ও অন্নাদি দিয়া পূজা করিবার সময় সাধক যে শ্লোক উচ্চারণ করেন তাহার অর্থ এই "এই ফুল, প্রদীপ বা অন্ন এক্ষণে সুন্দর, সুগন্ধিযুক্ত ও সুগঠিত, কিন্তু সহসা তাহা বিশ্রী, দুর্গন্ধময় ও কদাকার হইবে। তদ্রুপ জগতে সকলই অনিত্য, সুতরাং এই অনিত্যতা জ্ঞানে আমি বুদ্ধের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লোভ, দ্বেষ, মোহজাত কামনা ধ্বংস করিয়া যেন নির্ব্বাণের পাথে গমন করিতে পারি"। কিন্তু তাহাতে কোন বর প্রার্থনা করা হয় না, ইহাই আদর্শ পূজা।

ঈশ্বর

ইহা সত্য যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বর্ণিত সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মার অভাবে বা অস্বীকারে জীবন শুষ্ক বোধ হয়, দয়াময় পরমপিতার অভাবে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের যুক্তিবাদ সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য, যুক্তিবাদ সাধারণ মানবের মনে প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে, কিন্তু সত্য অবশ্যই বলিতে হইবে, জ্ঞানীগণ অবশ্যই তাহা উপলব্ধি করিবেন।

হিন্দুধর্ম্ম অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ও গোলযোগ পরিপূর্ণ। ইহা ইসলাম ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম অথবা বৌদ্ধধর্ম্মের মত নহে। ঐ ঐ ধর্ম্ম এক এক জন প্রচারক প্রচার করিয়া গিয়াছেন; প্রথম দুইটী ইশ্বরের বাক্যও তাঁহার দূত ও পুত্রের দ্বারা প্রচারিত, কোরাণে ও বাইবেলে সম্যক্ ধর্ম্মোপদেশ গ্রথিত; বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ দর্শন বা মনোবিজ্ঞান বুদ্ধের আপন সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলে প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধর্ম্ম এবং প্রত্যক্ষলব্ধ দর্শন এবং ত্রিপিটক গ্রন্থে সম্যক্ গ্রথিত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কি তাহা ঠিকরূপে বলা কঠিন। এই ধর্ম্মের উপদেশ কোন একজন জ্ঞানীর একটি গ্রন্থে

বা গ্রন্থসমূহে নিবদ্ধ নহে, যদিও গীতায় বিভিন্ন জ্ঞানীর উপদেশের সামঞ্জস্য করার চেষ্টা হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে যুগে যুগে জ্ঞানের স্ফূরণের সহিত এই ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে বর্ণিত ও অনেকস্থলে বিপরীতভাবাপন্ন উক্তি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। হিন্দুদের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতীয় ষড়দর্শনে দুঃখমুক্তির উপায়, স্বর্গ বা মোক্ষ লাভের উপায় বর্ণিত আছে। কিন্তু একটীর সহিত অপরটীর সামঞ্জস্য নাই। এই দর্শনশাস্ত্রকারগণ কোন ধর্ম্মও প্রচার করেন নাই। ইউরোপে বহু দার্শনিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দর্শন, ধর্ম্ম অথবা খৃষ্টধর্ম্মের অন্তর্গত নহে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শন (ত্রিপিটকের তৃতীয় পিটক অভিধর্ম্ম) বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তমাঙ্গ। আমি এস্থলে উক্ত ষড়দর্শন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইব, অবশ্যই হিন্দুগণ প্রায়ই বেদান্তদর্শনকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন, তাহাতেও আবার উদ্বৈতবাদী, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদী এই তিন সম্প্রদায়ের ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব সাযুজ্য ও সামীপ্যভেদে তিনটি বিভিন্ন মত; মোটের উপর হিন্দুধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত।

বৈদিক যুগে অর্থাৎ জ্ঞানের বাল্যাবস্থায় আর্য্যঋষিগণ সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির পিছনে অপরিসীম শক্তির বিকাশ দেখিয়া ইহাদেরই এক একটীকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেন এখনও বহু ধর্ম্মান্ধ হিন্দু এইরূপ পূজা করিতেছেন। উপনিষদ বা বেদান্তের যুগে অর্থাৎ জ্ঞানের যৌবনাবস্থায় বাহ্যজগত হইতে অন্তর্জগতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হইল, ঋষিগণ পরমাত্মার অংশভ্রমে আত্মার মধ্যেই ঈশ্বর দেখিতে পাইলেন এবং আত্মনিগ্রহপূর্ব্বক সাধনা দ্বারা ব্রহ্মলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। বেদমতে ঈশ্বর "অবাঙ্‌মনসোগোচর," "নেতি, নেতি," চিন্তা, বাক্য ও ধারণার অতীত হইলেও এবং ঈশ্বর এখানেও নাই, সেখানেও নাই বলা সত্ত্বেও বেদ পুনরায় ঈশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভক্তগণের বিশ্বাস বা অনুভবই যদি এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ হয় তবে কোন বিচার বা বিতর্কের আবশ্যকতা নাই। ঈশ্বরবিশ্বাসী অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা নাই, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছেন অথবা কিসের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।

এক্ষণে আমি যেই সমুদয় জ্ঞানী ও দার্শনিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের কয়েকজনের বিষয় উল্লেখ করিব। সুপ্রসিদ্ধ কপিলমুনি তাঁহার সাংখ্যদর্শনে, কণাদমুনি বৈশেষিকীদর্শনে, মহর্ষি জৈমিনী মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। মুণ্ডক উপনিষদ ও কঠোপনিষদে ঈশ্বরকে শক্তিহীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বেদান্তসূত্রের শঙ্করভাষ্যে (২। ১। ১৪-১৫) অজ্ঞ মানবের উপাসনার্থই ঈশ্বরকে আবার সর্বশক্তিমান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেন "যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ ভাগবৎ পড়ছে, কেউবা জাল করছে, প্রদীপ নির্লিপ্ত .....। তেমনি এই জগতে জ্ঞানভক্তি আছে, কামিনী কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে, কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেন ".....এই দিকে আমাদের প্রাণে একটা সাকার বস্তু চায় যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি, সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানবের চূড়ান্ত, কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ..... নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনায় তাঁহার প্রতি সচরাচর প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ (সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, পরম কারুণিক) অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক। সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে জ্ঞানবান বলা যাইতে পারে না, কারণ চিন্তা সসীমজীবের জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র, তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না" [ভারতে বিবেকানন্দ ২০৪/৩৭/৩৮ পৃষ্ঠা।] ফিউবারব্যাক সাহেব বলিয়াছেন "ঈশ্বর নাই ইহা দিবালোকের মত পরিস্কার, এমন কি ঈশ্বর থাকিতেই পারেন না [এন্-সাইক্লোব্রিটে, ২য় সংখ্যা, ৮২৭ পৃষ্ঠা।] জনফষ্টার "চালমারস্ নেচারেল থিওলজি" নামক পুস্তকে ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াছেন। ফিজিকাস সাহেব ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইয়া মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভলটেয়ার সাহেবেরও এই মত। তিনি আরো বলিয়াছেন ঈশ্বর না থাকিলেও একজন ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। জন্ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন তিনি ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানত্বের প্রমাণ পান নাই। ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা মাত্র। বেদান্তদর্শন ব্যতীত কোন দর্শনেই সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই; নির্গুণ ঈশ্বরের অর্থ তবে "কিছুই না," অন্ধ মানবগণের সান্ত্বনার জন্যই ইহা আরোপ করা হইয়াছে অথবা ইহা মিথ্যাদৃষ্টির ফল।

যাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াও তাঁহাদের প্রত্যেকের মতভেদ রহিয়াছে। বাইবেলের ঈশ্বর স্বর্গের সিংহাসনে আসীন আছেন। যদি অন্যান্যদের মতে প্রকৃতি, নিরাকার, প্রাকৃতিক শক্তি, স্বভাব, মহর্ষি কণাদের মতে পরমাণু, কিংবা উপনিষদ মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা বেদনান্তদর্শনের শঙ্করাচার্য্য * বর্ণিত "আমি" ঈশ্বরশব্দবাচক হয়, তবে ঈশ্বর স্বীকার বা অস্বীকারের আবশ্যকতা কোথায়?

এস্থলে বৌদ্ধ ধর্ম্মেঈশ্বর সম্বন্ধে কি বলা হয় তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। মানুষ তাহার নিজের স্রষ্টা, তাহার কর্ম্মই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা; অপরাধজনক কার্য্যের ক্ষমা করিবার কেহ নাই। মৃত্যুর পর জীবগণের ভালমন্দের দলিল দৃষ্টে পুরস্কার বা শাস্তি দিবার জন্য স্বর্গে বা অন্য কোথায়ও ঈশ্বর বসিয়া নাই। এইরূপ ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কল্পনা বৌদ্ধধর্ম্মে স্থান পায় নাই। ঈশ্বরাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলিতেন, এইরূপ অনাবশ্যকীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করা নিষ্ফল। তিনি বলিলেন, যদি কেহ শরাঘাতে অন্যকে বিদ্ধ করে এবং আহত ব্যক্তি বলে যে যতক্ষণ আক্রমণকারীর জাতি, গোত্র, বর্ণ, বয়স এবং শরীর বিভিন্ন উপাদান ইত্যাদি নির্ণয়পূর্ব্বক তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইবে না ততক্ষণ শর উৎপাটন করিতে দিবে না, তবে এই সমুদয় বিষয় জানিবার পূর্ব্বেই তাহাকে শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধের উপায়াদি নির্ণয়পূর্ব্বক বুদ্ধ জ্ঞান ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যদ্বারা মানুষ উপকৃত হইবে তৎসমস্তই বলিয়াছেন, এতদতিরিক্ত জানিতে চাহিলে শরবিদ্ধ ব্যক্তিটীর ন্যায় আক্রমণকারীর সন্ধান করিতে করিতে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবে। তিনি বলিয়াছেন, তিনি যাহা জানিয়াছিলেন তাহার সামান্য অংশ মাত্র শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অরণ্যের শিংশপা-পাতার তুলনায় একমুষ্টি পাতার সঙ্গে তুলনীয়, যাহা মানবের মুক্তির পক্ষে আবশ্যক তাহা সমস্তই বলিয়াছেন।

** তার্কিক শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের অবনতির সুযোগ লইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং নিরীশ্বরবাদের দোহাই দিয়া অজ্ঞজনকে ভ্রমে পাতিত করিলেন, কিন্তু বুদ্ধের অবিদ্যাকে মায়ায় পরিণত করিয়া ও তাহাদিগকে মায়াজালে আচ্ছন্ন করিয়া স্বয়ং জগৎকর্ত্তা ব্রহ্ম হইয়া বলিলেন "অহং ব্রহ্মাস্মি সোঽহং আমি ব্রহ্ম, তিনিই আমি। এইজন্য পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন।*

বৌদ্ধধর্ম্মে কর্ম্মকেই প্রধান্য দেওয়া হইয়াছে। আমি যদি অপরাধের কার্য্য না করি তবে পুলিশ বা বিচারকে ভয় কি? সুতরাং আমি পুলিশ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের সেবা করিব, না কর্ম্মের সেবা করিব? যদি কর্ম্মফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন তিনি কর্ম্মের দ্বারাই বাধ্য, পুণ্যের পুরস্কার বা পাপের দণ্ড বিধান করিবেনই, যদি বিচারে পক্ষপাত করা হয় তবে তিনি ঈশ্বর পদবাচ্য হইতে পারেন না, সুতরাং কর্ম্মই একমাত্র বন্ধু, কর্ম্মই একমাত্র স্মরণীয়, সকল প্রাণীই ঘুর্ণায়মান অনন্ত সংসারচক্রে বহু কল্পব্যাপী অনন্ত জন্মকৃত কুশলাকুশল কর্ম্মেরই উত্তারাধিকারী, কর্ম্মই ছায়ার ন্যায় এ জীবনে ও পরজীবনে অনুসরণ করে, তদ্ধেতু জ্ঞানমূলক কর্ম্মই বৌদ্ধদের একমাত্র করণীয়, "অবঙ্খানসোগোচর" ঈশ্বর তাহাদের স্মরণীয় নয়।

ইহার পরে আমি দেখাইব হিন্দুর ভারতীয় ষড়দর্শন মতে জন্ম নিবৃত্তিই মোক্ষ প্রাপ্তি, বৌদ্ধমতে তাহাই নির্ব্বাণ, সুতরাং ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ এক ও অভিন্ন, তবে এই নির্ব্বাণ কি সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা, বিধাতা ও ধ্বংসকর্ত্তা? সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাস * মিথ্যাদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহা সত্য যে আমরা ঈশ্বর, বিশ্বের আদি কারণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্নের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উত্তর চাই, তদ্ধেতু সম্ভবতঃ মেষদলকে খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখিবার জন্য (অর্থাৎ আপনাপন ধর্ম্মের গণ্ডীতে রাখার উদ্দেশ্যে) কল্পিত স্রষ্টাকে সৃষ্টি করা হয়, লোকের মনে সান্তনা দিবার জন্যও তাহার আবশ্যক হয় যেমন ভল্টেয়ার সাহেব তজ্জন্য একজন ঈশ্বরের সষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। অগ্রে পক্ষীর জন্ম না ডিম্বের জন্ম এ প্রশ্ন আমাদের মনকে আকুলিত করে, যদিও আমরা বিশ্বসৃষ্টির প্রহেলিকা সম্বন্ধে অবগত নহি তথাপিও মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় মরীচিকার দিকে ধাবিত হই, বৌদ্ধধর্ম্মই এইরূপ নিষ্ফল চেষ্টার বিরুদ্ধে সদর্পে মুখ ফিরাইয়া থাকে। ফ্লোরেন্স সাহেব এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ২য় ভাগের ৮২৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন–"যদি মানব প্রকৃতই উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন তবে নিরীশ্বরত্বের (অর্থাৎ আত্মশক্তির) উপরই ইহার ভিত্তি করিতে হইবে।"

** ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার জন্য মাতৃপূজায় মানবধর্ম্ম দ্রষ্টব্য।*

ঈশ্বরবাদের অভাবে অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মকে শূন্যবাদ * বা উচ্ছেদবাদ বলিয়া থাকেন, কিন্তু উচ্ছেদবাদ বা শাশ্বতবাদ নহে, ইহা যুক্তিবাদ। বুদ্ধ ব্রহ্মজালসুত্তে তখনকার প্রচলিত ৬২ প্রকার মত আলোচনা করিয়া বলেন উহার কোনটাই সত্য উপলব্ধির পথ নহে, তিনি যাহা স্বয়ং উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন জ্ঞানীগণই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, তর্কের দ্বারা তাহা উপলব্ধ হয় না, [মিঃ ঋজ ডেভিডের বৌদ্ধধর্ম্মের অনুবাদ ৪৫ পৃষ্ঠা।] বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ অস্বীকার, ইহার স্থাপনকর্ত্তার প্রতিও অলৌকিকত্ব অস্বীকার, ইহার ধর্ম্মগ্রন্থকে দৈববাণী বলিয়া অস্বীকৃত, এই ধর্ম্ম "এহিপাস্‌সিকা" অর্থাৎ স্বয়ং যুক্তি ও বিবেকের সহিত ইহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সাধারণকে আহ্বান, সব্বজীবে অপার করুণা, ও দেবপূজা প্রভৃতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন কার্যাদির অযৌক্তিকতা, আত্মোন্নতির সুনির্দ্দিষ্ট নীতি, সম্যক্ জ্ঞানলাভের সুনিয়ন্ত্রিত উপায়, কর্ম্মফলের অমোঘ বিধান, যুক্তি ও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ইহার অনাত্মবাদ, ইহার সম্যক্ আত্মনির্ভরতা, ঈশ্বর বা কোন প্রতিনিধির মধ্যস্থতা ব্যতীত চিরশান্তি ও নির্ব্বাণলাভের পরীক্ষিত উপায়, মানবের প্রতি অসীম সাহসিক বার্ত্তা "তুমি তোমার নিজের কর্ত্তা, নিজের স্রষ্টা, তুমি তোমার পরিত্রাতা"–এই সমুদয় বৌদ্ধধর্ম্মের সম্যক্ যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বোধ হয় আপনাদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছি, নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব।

নির্ব্বাণ

নির্ব্বাণ মানব জীবনের শেষ কাম্য, মনুষ্যজীবনে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান অর্জ্জনপূর্ব্বক মানবের প্রকৃত সত্য অবস্থার সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি এবং জন্ম মৃত্যুর অতীত চিরশান্তি ময় অবস্থা, ইহা তৃষ্ণা–লোভ, দ্বেষ ও মোহের নির্ব্বাণ। সেই পূর্ণশান্তিময়

---

* *কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন ঃ ..... "শূন্যবাদ দর্শনশাস্ত্রের শিরোরত্ন, এ পর্যন্ত দার্শিনক চিন্তা শূন্য অপেক্ষা কোন অধিকতর উচ্চশিখরে অধিরোহন করিতে পারে নাই, শূন্য যোগীর পরম ধ্যেয় পাদার্থ এখানে 'অস্তি'ও নাই, 'নাস্তি'ও নাই, এখানে 'অস্তি' 'নাস্তি'র সমন্বয়, এখানে উৎপত্তি ও বিনাশ, ক্ষণিকত্ব, নিত্যত্ব, একাত্ব, নানাত্ব এই সকল আপতবিরুদ্ধধর্ম্ম পরস্পরের সহ বিরোধ ত্যাগ করিয়া অবস্থিত আছে, এখানে ভাব ও অভাবের সমন্বয়, এখানে উৎপত্তি ও বিনাশের সামঞ্জস্য, বেদ যে পদার্থের কথা বলিয়াছেন "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সেই পদার্থ শূন্য ভিন্ন আর কিছু নহে–*

নির্ব্বাণের অপার্থিব আনন্দ অর্হৎগণই অনুভব ও উপভোগ করিতে সমর্থ, বুদ্ধ ইহা স্বয়ং উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, শুধু তর্কের দ্বারা ইহা উপলব্ধ হয় না। যাহারা কখনও চিনি আস্বাদন করে নাই তাহাদিগকে চিনির আস্বাদ বুঝাইয়া দেওয়া বা তাহা উপলব্ধি করা অসম্ভব। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮/১৫/১) ব্রহ্মনির্ব্বাণের উল্লেখ আছে এবং বলা হইয়াছে ব্রহ্মলোক হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, কিন্তু ব্রহ্মত্বলাভ বৌদ্ধনির্ব্বাণের বহু নিম্নস্তরে অবস্থিত, মানুষ সাধনাবলে ও সুকৃতির ফলে দেবলোকের উপরে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধের মতে ব্রহ্মলোকেও জীব বাসনা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং সুকৃতির ক্ষয়ে পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, গীতার ২য় অধ্যায়ের ৪২/৪৩/৪৪ শ্লোকে এবং অষ্টম অধ্যায়ের ১৫/১৬ শ্লোকেও তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ষড়দর্শনের মোক্ষ বা মুক্তি এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণ এক, কারণ জন্মনিবৃত্তি উভয়ে সাধারণ, কিন্তু উক্ত ছয় জন ঋষি পূর্ব্ব কথিত চারিটি লোকোত্তর ধ্যান উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তৎ দর্শনে উল্লিখিত হয় নাই।

বুদ্ধের প্রথম ৫জন ব্রাহ্মণশিষ্য, মহাপ্রজাপতি, আরো ৫০০ এর অধিক সঙ্ঘ (বৌদ্ধভিক্ষু) বুদ্ধের জীবনকালেই অর্হত্ত্ব বা নির্ব্বাণ * প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য ও নিত্যসহচর আনন্দ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের তিন মাসের মধ্যে অর্হৎ হইয়াছিলেন এবং রাজা অজাতশত্রুর সহযোগিতায় রাজগীর পাহাড়ে সপ্তপর্ণীগুহার সম্মুখে নির্মিত সভামণ্ডপে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতিতে অপর ৪৯৯ জন অর্হৎসহ সদস্যরূপে সভার কার্য্য পরিচালনে অর্থাৎ বৌদ্ধত্রিপিটক সংগ্রহ ও সঙ্কলনে যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যে অর্হৎ হইয়াছিলেন তখনকার সঙ্কলিত ধর্ম্মগ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুদর্শন অবলম্বনে কোন জ্ঞানী চারি লোকোত্তর ধ্যান অতিক্রমপূর্ব্বক নির্ব্বাণ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি পাঠে আমার সম্যক্ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে বুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রাচারের বিপরীত ও হিন্দুধর্ম্মের অজ্ঞাত নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধমতে আর্য্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসমুদ্রে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু পরপারে উঠিতে পারেন নাই,

---

* নির্ব্বাণ দুই প্রকার, সাধনাবলে অর্হত্তলাভ জীবনকালেই স-উপাধিশেষ নির্ব্বাণ এবং অর্হতের দেহ ত্যাগের অনুপাধিশেষ নির্ব্বাণ বা পরিনির্ব্বাণ।

তাঁহারা ঈশ্বর ও আত্মার ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন, কিন্তু বুদ্ধ ষড়বর্ষব্যাপী সাধনার ফলে তাঁহার সম্যক্-দৃষ্টিতে পরম শান্তিপদ লাভের জন্য ঈশ্বরের অনাবশ্যকতা উপলব্ধি ও আত্মার অনিত্যতা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সেই জ্ঞান সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপসংহার

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি শ্রীঘ্রই আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। যখন মানুষের অসমতা, জাতিভেদ, জাতিবিদ্বেষ, স্পর্শদোষ, দেবপূজায় ও পশুবলির রক্তস্রোতে ভারতের আকাশবাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল তখন পাপভারাক্রান্ত ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধ অবতীর্ণ হন, তখন শূদ্রগণের বেদস্পর্শ করা দূরের কথা, শুনিবার অধিকারও ছিল না। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। বুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দেবপূজা ও বলি দানের অসারত্ব এবং মানুষের সাম্যবাদ প্রচার করেন এবং বলেন জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হইতে পারেনা, কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় এবং তিনি জনসাধারণের সুবিধার জন্য তখনকার প্রচলিত পল্লীভাষা-পালিভাষাতেই উচ্চনীচ সকলের নিকট তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সদিচ্ছা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বপ্রেম সকলের দ্বারে উপস্থিত করা হয় এবং সকলকে সাদরে আহ্বান করা হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সম্রাট অশোক সমগ্র ভারতবর্ষ, পারস্য ও আফগানিস্থান ধর্ম্মের অনুশাসনের দ্বারা শাসন করেন এবং সর্ব্বত্র প্রস্তরে, স্তম্ভে, গিরিগাত্রে ও গিরিগুহায় ধর্ম্মোপদেশ ক্ষোদিত করাইয়া দেন, এমনকি তিনি তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সঙ্ঘে প্রবেশ করাইয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ সিংহলে প্রেরণ করেন। তৎপরেও বৌদ্ধরাজন্যবৃন্দ ছাত্রাবাসসহ জগদ্বিখ্যাত নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এমনকি ভারতের বাহির হইতেও বহু শিক্ষার্থী এই সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হইতেন। চীনপরিব্রাজক হুয়েনসাং-এর লিপি হইতে জানা যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশসহস্র ছাত্র ছয়খানি ইষ্টকনির্ম্মিত চারিতালা গৃহের ১০০টি কামরায় থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র ও ভেষজবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন, (গভর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ নালন্দা কলেজের কতেকাংশ ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন)। বুদ্ধের জন্মভূমি বলিয়াই ভারতমাতা জগতের

ধর্ম্মগুরু বলিয়া গৃহীতা ও সর্ব্বত্র সম্মানিতা। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে বৌদ্ধযুগে ভারত শিক্ষায়, সভ্যতায়. শিল্পে, বাণিজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, ভাস্কর্য্যে উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল, কালের কঠোর আবর্ত্তনে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হইলে মানবের সেই সর্ব্বোচ্চ নীতি সাম্যবাদ প্রভৃতি বিলুপ্ত হইল, আবার জাতিদোষ, স্পর্শ দোষাদির ফলে আভ্যন্তরিক বাদবিসম্বাদ, দলাদলি ও অনৈক্য ভারতকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিল এবং আলেকজাণ্ডার, মহম্মদঘোরী, বাবর, বক্তিয়ারখিলজী বহুধাবিভক্ত ভারতকে পরাজয়ের ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের সমতল ভূমি হইতে অদৃশ্য হইয়া হিমালয়ের পাদদেশসমূহে, আসামে ও চট্টগ্রামবিভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু বৌদ্ধসভ্যতা ও কৃষ্টি সমগ্র হিন্দুভারতে সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা স্বীকৃত বিষয় যে হিন্দুগণ বুদ্ধকে ঈশ্বরের নবম অবতার * রূপে গ্রহণ করিলেন, বুদ্ধমন্দিরে হিন্দুর দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "বৌদ্ধধর্ম্মে" লিখিয়াছেন–"হিন্দুরা বুদ্ধদেবকেও আপনাদের দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থানদান করতঃ আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

---

* *হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত নয় অবতারের মধ্যে বুদ্ধব্যতীত পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণই প্রধান, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্কও ছিল। পরশুরাম সংখ্যাতীত ক্ষত্রিয় নিধন করিয়া এবং পিতার আদেশে মাতার শিরচ্ছেদ করিয়া নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; রামচন্দ্র বিনা অপরাধে ও অলক্ষিতে বালিবধ এবং অসংখ্য রাক্ষস বধ করিয়া এবং জলন্ত অগ্নিতে সীতার সতীত্বের প্রমাণ পাইয়াও সেই অন্তঃসত্ত্বা সীতাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিতা করিয়া নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; অর্জ্জুন আত্মীয় স্বজন বধের অসারত্ব দেখিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার সঙ্কল্প করিলে শ্রীকৃষ্ণ আত্মার অমরত্বের মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন এবং "অশ্বত্থমাহতঃইতি গজঃ" এই মিথ্যাভাষণে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ কলঙ্কবিনির্ম্মুক্ত এবং বিশ্বপ্রেম ও ক্ষমার অবতার।*

প্রকৃতপক্ষে অবতারবাদ সৃষ্টির ক্রমোন্নতির রূপক ইতিহাস। সূর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত অগ্নিময় গোলক ক্রমে তাপ বিকীরণ করিতে করিতে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ শীতল হইয়া জল উৎপন্ন হয়, তৎপরে প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে মৎস্য উৎপন্ন হয়, ইহাই মৎস্য অবতার, তৎপরে জলস্থল বিহারী কুর্ম্ম, সরীসৃপাদি উৎপন্ন হয়, ইহাই কুর্ম অবতার, তৎপরে চতুষ্পদ প্রাণী শুকরাদির উৎপত্তি হয়, ইহাই বরাহ অবতার, তৎপরে অর্দ্ধমানব-অর্দ্ধপশু বনমানুষ, বানরাদি উৎপন্ন হয়, ইহাই নৃসিংহ অবতার, তৎপরে এই সর্ব্ব প্রথমে খর্ব্ব মানুষের উৎপত্তি হয়, ইহাই বামন অবতার, তৎপরে উহা হইতে উন্নতর মানব পরশুরাম অবতার, তৎপরে উহা হইতে আরো উন্নতর রাম অবতার, তৎপরে উহা শ্রেষ্ঠতর কৃষ্ণ বলরাম অবতার, তৎপরে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ–দয়ার অবতার বুদ্ধ অবতার।

দেখুন, হিন্দুরা লোকভুলানো মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগে কেমন পটু, তাঁহারা ধ্যানস্থ বুদ্ধকে যোগাসনরূঢ় মহাদেব গড়িয়া তুলিয়াছেন, কত কত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধক্ষেত্রকে আপনাদের তীর্থ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন, বৌদ্ধদের ধর্ম্মক্রিয়া যাত্রা মহোৎসবাদির অনুকরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মহিমাবৃদ্ধি করিয়াছেন।" তিনি ঐ পুস্তকের ২২২/২২৩ পৃষ্ঠায় আবার লিখিয়াছেন–"গয়ার একটী দেবালয়ে একখানি গোলাকৃতি প্রস্তরে দুইটী পদচিহ্ন আছে, প্রথমে উহা বুদ্ধপদ ছিল, পরে তাহা বিষ্ণুপদ বলিয়া প্রচারিত হয়। গয়াও পূর্ব্বে বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, পরে একটী প্রধান হিন্দুক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে, গয়ামহাত্ম্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে তীর্থযাত্রীরা বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধগয়া গমনপূর্ব্বক বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করিবেন, "ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং মহাবোধি তরুং নমেৎ।" হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছিল কিন্তু হজম করিতে পারে নাই, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট ও নিবিষ্ট, হিন্দুধর্ম্মের রক্তে বৌদ্ধমর্ম্ম সিঞ্চীবিত রহিয়াছে। বৌদ্ধযুগ হিন্দুভারতে এক বিরাট সাহিত্য ও সংস্কৃতি রাখিয়া গিয়াছে, হিন্দুভারত সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের উত্তরাধিকারী, "ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ভারতীয় হিন্দুগণ চর্ম্মে হিন্দু হইলেও রক্তে তাহারা বৌদ্ধ।" রামকৃষ্ণমিশন, ভারত সেবাসঙ্ঘ, প্রবর্ত্তকসঙ্ঘ প্রভৃতি জনসেবা সমিতি বুদ্ধের সেবাধর্ম্মের আদর্শে গঠিত, ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে দেব মন্দির, ধর্ম্মশালা স্থাপন বৌদ্ধ সংস্কৃতিরই ফল, নানাস্থানে রোগীর জন্য বেসরকারী হাসপাতাল এবং সরকারী হাসপাতাল ও পশুর জন্য হাসপাতাল মহারাজ অশোকের আদর্শে সৃষ্ট বৌদ্ধযুগের শিল্প ও স্থপতিবিদ্যা হিন্দু ও মুসলমান ভারতে অত্যাশ্চর্য্য অট্টালিকা ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণে অনুপ্রেরণা দিয়াছে, বুদ্ধের কর্ম্মক্ষেত্র বিহারে এবং পশ্চিম ভারতে নিরামিশ ভোজন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অহিংসা নীতি অবলম্বনে গৃহীত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে বিশ্বভারতীকে আন্তর্জাতিক জ্ঞানসাধনার কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী বুদ্ধের অহিংসা নীতির আংশিক * গ্রহণ করিয়া মানবের প্রতি অহিংসানীতি অবলম্বনে ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনয়ন করিতে সমর্থ বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তিনি বুদ্ধের সাম্যবাদ অনুসরণপূর্ব্বক

---

* কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বজীবের প্রতি অহিংসা নীতি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাও অনয়ন করিতে সমর্থ এবং বুদ্ধ স্বীয় জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও হরিজনগণের বিরুদ্ধে রুদ্ধদ্বার বর্ণহিন্দুর উচ্চতর (?) ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশে সমানাধিকার দিয়া এবং বুদ্ধের অনুকরণে স্পর্শদোষের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া ভারতে অখণ্ড হিন্দুশক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম অন্ধকার ভারত হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল, কিন্তু শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সভ্যতা ভারতের বাহিরে ও সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার মিশর হইতে আমেরিকার গোয়াতেমালা (গৌতমমালা) পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়াছিল, বৌদ্ধসঙ্ঘগণ দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা ও উত্তাল তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র পার হইয়া দেশ দেশান্তরে প্রেম ও সাম্যবাদের বার্ত্তা বহন করিয়া নিয়াছিলেন, সিংহল, ব্রহ্মা, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধরাজ্যের সংস্কৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবদান। লর্ড রোনাল্ডসে বলিয়াছেন–"বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিশিক্ষার মূল্য শুধু অনুমানের বিষয় নহে, যাঁহারা বৌদ্ধদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বত্র এই শান্তিধর্ম্মের প্রভাব অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।" মিঃ বি. হল. চেম্বারলেন মহোদয় লিখিয়াছেন–"বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানদেশে শিল্প ভাস্কর্য্যাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে গল্পগুজব গঠিত করিয়াছে, অভিনয়-মূলক কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে, রাজনীতি এবং সর্ব্বত্র সামাজিক জ্ঞানমূলক কর্ম্ম প্রবণতাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এক কথায় বলিতে গেলে বৌদ্ধধর্ম্মই শিক্ষক যাহার উপদেশে জাপানী জাতির অভ্যুদয় সংগঠিত হইয়াছে।" বৌদ্ধধর্মের প্রচার অবলম্বনে ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম্মে প্রচার কার্য্য সৃষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিপিটকের অনেকাংশ ইউরোপের নানা ভাষায় অনুদিত হইয়াছে, এক্ষণে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে, আমেরিকায় বৌদ্ধসভা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধত্রিপিটক রাশিয়ার ভাষায় ভাষান্তরিত করিতে তত্রত্য প্রসিদ্ধ প্রফেসরগণকে সাহায্য করিবার জন্য যুক্ত প্রদেশের তদানীন্তন ভিক্ষু বৌদ্ধপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নকে দুইবার নিমন্ত্রণ করিয়া নেওয়া হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়া হইতে রাশিয়ার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করা সম্বন্ধে কয়েকজন পণ্ডিত ভিক্ষুকেও এক সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া নেওয়া হইয়াছিল। স্বাধীনতার উপাসকের নিকট ঈশ্বরনিরপেক্ষ এবং স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার বীজমন্ত্রনিহিত বৌদ্ধধর্ম্ম আদরণীয় গ্রহণীয় হইবে সন্দেহ কি? আশা করা যায় জ্ঞান ও যুক্তিবাদ এবং ন্যায়শাস্ত্রের প্রসারের

সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জ্ঞানী সমাজ বুদ্ধকেই একমাত্র আদর্শ ও মুক্তিদাতা বলিয়া বরণ করিয়া লইবেন এবং মহাযুদ্ধের ধ্বংসের পর বৌদ্ধধর্ম্ম ক্লান্ত ও অনুতপ্ত পৃথিবীতে শান্তি ও সুখ আনয়ন করিবে, বৌদ্ধধর্ম্মই বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বপ্রেমের বন্ধনে পাশ্চাত্য দেশ ও প্রাচ্য দেশকে সংযুক্ত করিবে এবং উভয় দেশের কৃষ্টিগত সম্বন্ধ স্থাপন ও বর্দ্ধন করিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সহিষ্ণুতার সহিত এতক্ষণ ধরিয়া আমার বক্তৃতা শ্রবণ করায় আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু

শ্রী উমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী।

২৫ / ৮ / ৪৫

বুডি-স্ট রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত সিরিজ গ্রন্থমালা

১। তথাগত বুদ্ধের বোধি বিধি—ড. জিনবোধি ভিক্ষু

২। উচ্চ মাধ্যমিক পালি গাইড—অধ্যাপক ধর্মকীর্তি ভিক্ষু।

৩। মহাশান্তি মহাপ্রেম—শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

৪। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ—শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

৫। বুদ্ধ বন্দনা—ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী

৬। সীবলী ব্রতকথা—বিশুদ্ধাচার স্থবির

৭। বিদর্শন সাধনা—শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

৮। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্ম হইতে ইহার পার্থক্য—
শ্রীউমেশচন্দ্র মুচ্ছদী